শুকতারা

স্বর্ণখনির অন্তরালে

ষটচত্বারিংশৎ বর্ষ
সপ্তম সংখ্যা
ভাদ্র·১৪০০

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - হরিদাস পাল

স্ক্যান করেছেন - হরিদাস পাল

এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা স্ক্যান করতে চান কিংবা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

ভারতের সর্বাধিক জনপ্রিয় কমিকস্ 'ডায়মন্ড কমিকস'
প্রতি মাসে প্রকাশ করছে চাচা চৌধুরী, রমন, বিল্লু,
পিঙ্কী, আর ফ্যান্টমের নিত্যনতুন
এবং আকর্ষণীয় কান্ডকারখানা।

কার্টুনিষ্ট প্রাণের প্রসিদ্ধ চরিত্র চাচা চৌধুরী ওনার কম্পিউটারের চেয়েও প্রখর বুদ্ধির জোরে মুহূর্তের মধ্যে যে কোনও সমস্যার সমাধান করে ফেলেন। জুপিটারবাসী অসীম শক্তিমান সাবু ওনার প্রধান সাহায্যকারী। শক্তি ও বুদ্ধির এই অপূর্ব সংমিশ্রণ তোমাদের আনন্দ দেবে।

মধ্যবিত্ত কেরাণীর সমস্যাগুলোর সঙ্গে অনবরত লড়াই চালাবার সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে আনন্দও দিয়ে আসছে কার্টুনিষ্ট প্রাণের অদ্ভূত চরিত্র রমন। পেটে খিল ধরিয়ে দেবার মত হাসিতে ভরপুর রমনের নতুন কমিকস্।

কার্টুনিষ্ট প্রাণের আরেকটি স্মরণীয় সৃষ্টি পিঙ্কী ওর দাদু আর ঝপটজীকে সঙ্গে নিয়ে অদ্ভূত-অদ্ভূত কান্ডকারখানা করে তোমাদের তো বটেই, অত্যন্ত গোমড়া-মুখোদেরও মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলছে।

কার্টুনিষ্ট প্রাণের আরেকটি চঞ্চল চরিত্র বিল্লু ওর সঙ্গীসাথী গাব্দু, জোজি আর বজরঙ্গী পালোয়ানকে নিয়ে তোমাদের আনন্দ দেবার জন্য বুকষ্টলে হাজির হয়ে গেছে।

সমগ্র বিশ্বে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ফ্যান্টম-এর কাহিনী বাচ্চা-বুড়ো সবার কাছে সমান মনোরঞ্জক। প্রাচীন কাল থেকে বংশানুক্রমে অসহায়ের বন্ধু এবং অপরাধীদের কাছে সাক্ষাৎ যমদূত ফ্যান্টমের সৃষ্টিকর্তা শ্রী লী ফক্।

ডায়মন্ড কমিকস্-এর নবতম নিবেদন

ব্রহ্মান্ডের অধিপতি 'হী-ম্যান' এখন বাংলাতেও ডায়মন্ড মিনি কমিকসে প্রকাশিত হয়েছে!

সংখ্যা : 1-12

প্রতি সংখ্যার মূল্য : 3/-

বিশ্ববিখ্যাত কমিকস্ 'স্পাইডার-ম্যান' এখন বাংলাতেও! সংখ্যা 1-2 ষ্টলে হাজির হয়ে গেছে।

মূল্য: 8/-

ষ্টীকার ফ্রী

DIAMOND COMICS (P) LTD.

2715, Darya Ganj New Delhi-110 002.

DISTRIBUTORS **VISHAL BOOK CENTRE** 4 TOTTEE LANE CALCUTTA-16

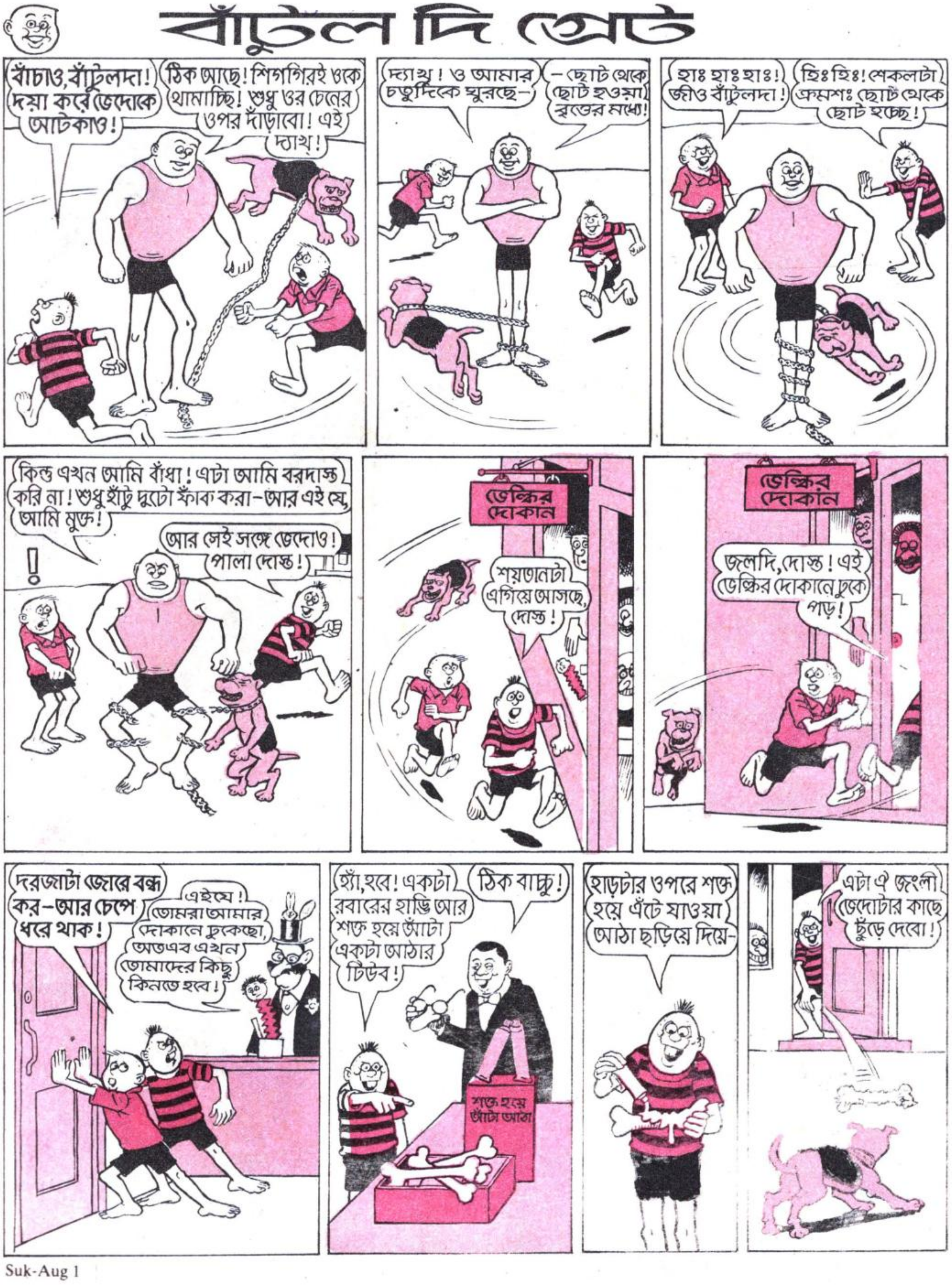
বাঁটুল দি গ্রেট
বাঁচাও, বাঁটুলদা! দয়া করে ভেদোকে আটকাও!
ঠিক আছে! শিগগিরই ওকে থামাচ্ছি! শুধু ওর চেনের ওপর দাঁড়াবো! এই দ্যাখ্‌!
দ্যাখ্‌! ও আমার চতুর্দিকে ঘুরছে—
—ছোট থেকে ছোট হওয়া বৃত্তের মধ্যে!
হাঃ হাঃ হাঃ! জীও বাঁটুলদা!
হিঃ হিঃ! শেকলটা ক্রমশঃ ছোট থেকে ছোট হচ্ছে!
কিন্তু এখন আমি বাঁধা! এটা আমি বরদাস্ত করি না! শুধু হাঁটু দুটো ফাঁক করা—আর এই যে, আমি মুক্ত!
আর সেই সঙ্গে ভেদোও! পালা দোস্ত!
!
ভেল্কির দোকান
শয়তানটা এগিয়ে আসছে, দোস্ত!
ভেল্কির দোকান
জলদি, দোস্ত! এই ভেল্কির দোকানে ঢুকে পড়!
দরজাটা জোরে বন্ধ কর—আর চেপে ধরে থাক!
এইযে! তোমরা আমার দোকানে ঢুকেছো, অতএব এখন তোমাদের কিছু কিনতে হবে!
হ্যাঁ, হবে! একটা রবারের হাড্ডি আর শক্ত হয়ে আঁটা একটা আঠার টিউব!
ঠিক বাচ্চু!
শক্ত হয়ে আঁটা আঠা
হাড়টার ওপরে শক্ত হয়ে এঁটে যাওয়া আঠা ছড়িয়ে দিয়ে-
এটা ঐ জংলী ভেদোটার কাছে ছুঁড়ে দেবো!

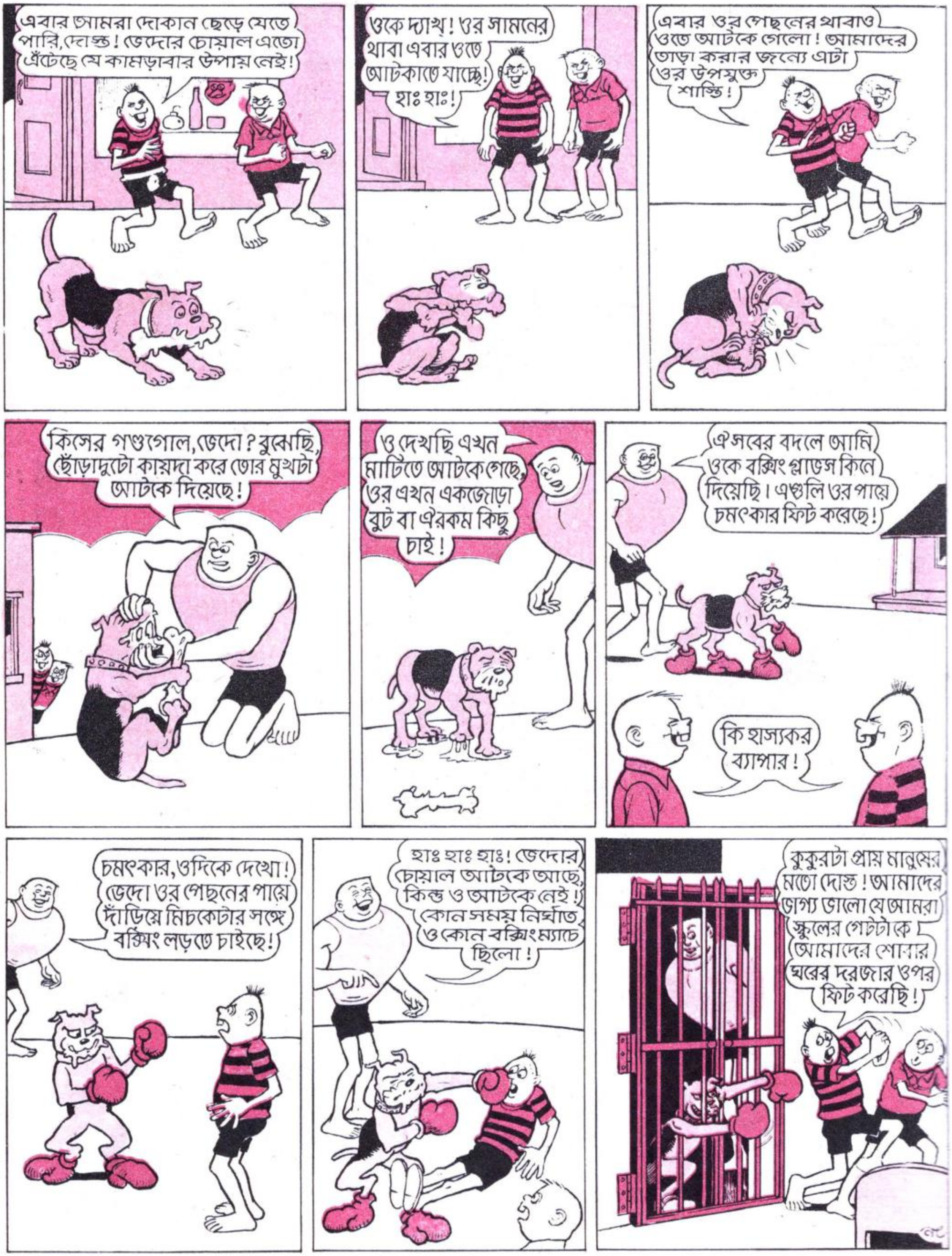
এবার আমরা দোকান ছেড়ে যেতে পারি, দোস্ত! ভেদোর চোয়াল এতো এঁটেছে যে কামড়াবার উপায় নেই!
ওকে দ্যাখ্! ওর সামনের থাবা এবার ওতে আটকাতে যাচ্ছে! হাঃ হাঃ!
এবার ওর পেছনের থাবাও ওতে আটকে গেলো! আমাদের তাড়া করার জন্যে এটা ওর উপযুক্ত শাস্তি!
কিসের গণ্ডগোল, ভেদো? বুঝেছি, ছোঁড়াদুটো কায়দা করে তোর মুখটা আটকে দিয়েছে!
ও দেখছি এখন মাটিতে আটকে গেছে, ওর এখন একজোড়া বুট বা ঐরকম কিছু চাই!
ঐসবের বদলে আমি ওকে বক্সিং গ্লাভস কিনে দিয়েছি। এগুলি ওর পায়ে চমৎকার ফিট করেছে!
কি হাস্যকর ব্যাপার!
চমৎকার, ওদিকে দেখো! ভেদো ওর পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে মিচকেটার সঙ্গে বক্সিং লড়তে চাইছে!
হাঃ হাঃ হাঃ! ভেদোর চোয়াল আটকে আছে, কিন্তু ও আটকে নেই! কোন সময় নির্ঘাত ও কোন বক্সিং ম্যাচে ছিলো!
কুকুরটা প্রায় মানুষের মতো দোস্ত! আমাদের ভাগ্য ভালো যে আমরা স্কুলের গেটটাকে আমাদের শোবার ঘরের দরজার ওপর ফিট করেছি!

শুকতারা

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত ছোটদের সেরা মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

ভাদ্র ১৪০০
আগস্ট ১৯৯৩

প্রচ্ছদ
স্বর্ণখনির অন্তরালে—নারায়ণ দেবনাথ

শ্রদ্ধাঞ্জলি
পরিব্রাজক বিবেকানন্দ —স্বামী মুক্তিকামানন্দ ৫০

ধারাবাহিক
অরণ্যপতি টারজান (অ্যাডভেঞ্চার)—সব্যসাচী ৩৬
জঙ্গল রহস্য (উপন্যাস) —শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৬

সম্পূর্ণ কল্পবিজ্ঞান কাহিনী
কসমস ফাইভ বনাম ডেল্টা টোয়েন্টি এইট —ডাঃ দেবব্রত রায় ২০

গল্প
সপ্তর্ষি সরোবরের ওধারে —অনির্বাণ সেনগুপ্ত ৩০

ভূতের গল্প
দুঃখীরাম-শান্তিরাম —মণিলাল মুখোপাধ্যায় ১১

রূপকথার গল্প
চন্দ্রানদীর পাড়ে —কিরণশঙ্কর মৈত্র ৬৩

হাসির গল্প
পিসি ও লুসি—দেবীপ্রসাদ রায় ৪০

পুরস্কৃত গল্প
পয়সা খোঁজা দৌড় (প্রথম) —মামন দেবনাথ ৬৮
জলটোপ (দ্বিতীয়) —তুষার মিঞা ৬৮

ফিচার
শেরপা কিশোরের স্বপ্ন —অরিন্দম দেবনাথ ৭১
বিজ্ঞানের খবর—সন্দীপ সেন ৪৯
ভবিষ্যতের ঠিকানা —পদ্মা চৌধুরী ৩৯

বিশ্ববিচিত্রা
জিজ্ঞাসা ৬৫

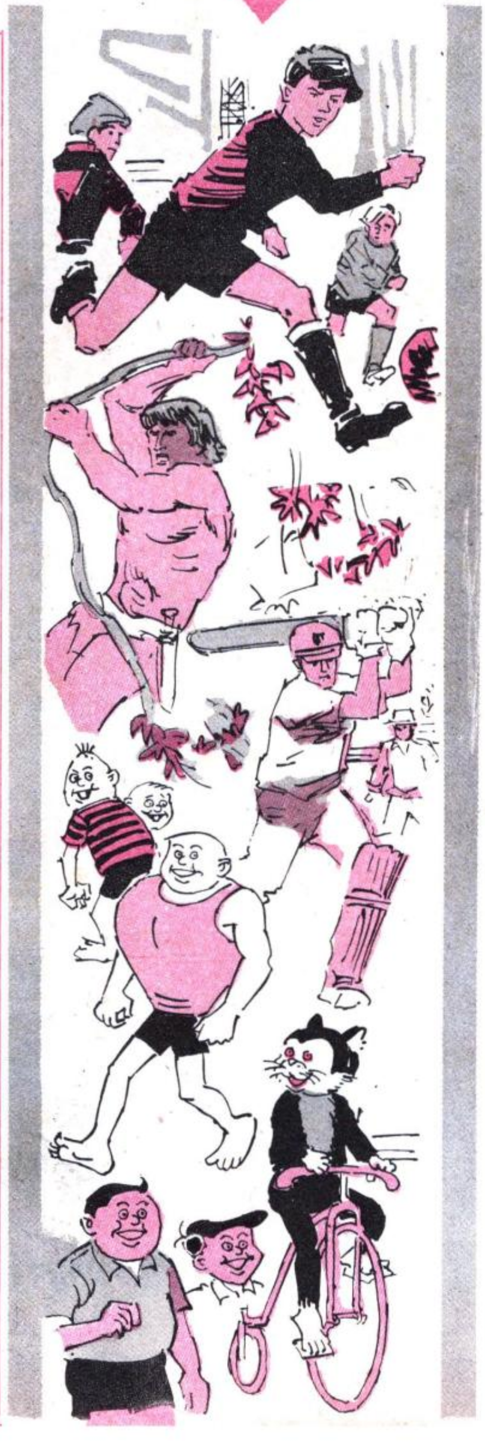

কবিতা
সন্ধি—জয়নাল আবেদীন ৫

বিভাগীয় লেখা
খেলা—শা. প্রি. ব. ৫৩
ক্লাব পরিচিতি—সুমন ভট্টাচার্য ৬০
পড়ার সঙ্গে খেলা —সর্বাণী মুখোপাধ্যায় ৬১
শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম —তুষার শীল ৬২
দাদুমণির চিঠি ১৫
তোমাদের পাতা ১৬
মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ৪৬

ছবিতে গল্প
যুগ যুগান্তের যাত্রী (রঙিন) — ময়ূখ চৌধুরী ১৮
বাঁটুল দি গ্রেট (রঙিন) —নারায়ণ দেবনাথ ১
হাঁদা-ভোঁদা—নারায়ণ দেবনাথ ৪৪
বিলির বুট (রঙিন) ৬৬
ভয়ঙ্করের মোকাবিলায় ম্যাম'জেল এক্স ২৮

ঘোষণা
নিতাইলাল সাহা স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতা ৭০

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION WEST BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE MEMO NO. 456 (17)-T.B.C. (Dated 5-7-88)

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য - হাতে নিলে ৯০ টাকা। ডাকেঃ বুক পোস্টে - ১১০ টাকা, রেজিস্ট্রি ডাকে ১৭০ টাকা।

Annual Subscription
Bangladesh— **Rs. 235.00**
U.K. and U.S.A.— **By Sea Mail Rs. 327.00**
By Air Mail Rs. 552.00

R.N.I.
Registration No. 2621/57

দাম ঃ ৮ টাকা মাত্র

বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের চাই কমপ্লান

কমপ্লানেই আছে এদের প্রতিদিনের একান্ত প্রয়োজনীয় ২৩-টি খাদ্যগুণ।

সাধারণতঃ ছেলেমেয়েরা ১৫ বা ১৬ বছর বয়সের মধ্যে প্রায় সবদিক থেকেই পুরোপুরি ভাবে বেড়ে ওঠে। আর প্রোটিন-ই হল সেই প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণ, যা সরাসরিভাবে এই বেড়ে উঠায় সাহায্য করে। তাই আপনার ছেলেমেয়েদের অবশ্যই চাই কমপ্লান।

কমপ্লানে আছে ২০% মিল্ক প্রোটিন, যা বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের জন্যে আদর্শ প্রোটিন। এছাড়াও, এতে আছে আরো ২২-টি খাদ্যগুণ, যা ওদের সবদিকেই সুস্থ-সবল ভাবে বেড়ে ওঠার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়।

কমপ্লান® সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

Chaitra Leo Burnett *B* GX 127/203 BEN

৪৬শ বর্ষ ● ৭ম সংখ্যা ● ভাদ্র ১৪০০/আগস্ট ১৯৯৩

সন্ধি

জয়নাল আবেদীন

রায়বাবুদের বাবুমানি
আজকে রানীর
মার খেয়েছে
কারণটা কি ? বাবু নাকি
ভেঙচি কেটে
গান গেয়েছে।

বাবুমানির সোনার কলম
শুনবে যখন
খোয়া গেছে
ঠিক জানবে কোথাও সে নেই
রানীবালার
ব্যাগে আছে।

রোজ বিকেলে বাবু যখন
ঘুরবে পাড়ার
চতুর্দিকে
তখন খুকী খোকার খাতায়
খুব গোপনে
আসবে লিখে।

খুকীর ইঁদুর পরলে সিঁদুর
খোকার বিড়াল
করবে তাড়া
খোকাবাবু বই খুললে
চেঁচিয়ে খুকী
ভাঙবে পাড়া।

কিন্তু রাতে নড়লে কিছু
জপবে দু'জন
হরি হরি
সব যুদ্ধের সন্ধি হয়ে
রইবে শুয়ে
জড়াজড়ি।

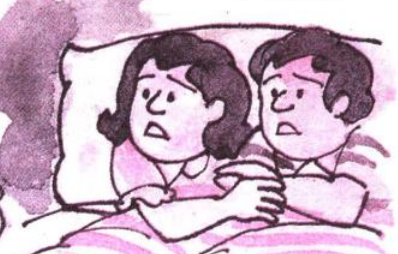

ছবি : সুফি

জঙ্গল রহস্য

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

(সাত)

এটা তাহলে আর একটা! ভালোই হয়েছে। বেঁধে ফেল। সব কটাকে এক সঙ্গে চালান করবো। ফালতু কয়েকটাকে পাওয়া গেলো, দাঁওটা ভালোই মারা যাবে।

কথা বলতে বলতে যণ্ডামার্কা লোকটা তার হাতের রিভলভারটা পকেটে পুরতে গেলো।

মিউ চুপ করে ছিলো। ও আগেই দেখে নিয়েছে ওপাশের ঘরের ওপরের স্কাইলাইটের ফাঁক গলে বাবু নেমে পড়েছে। কিকি এসে বসেছে লোকগুলোর পেছন দিকে। দুটো বাঁদরও রেডি। শুধু ইশারা করার অপেক্ষা।

লোকটা রিভলভার পকেটে পুরতেই বাবু পেছন থেকে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিকি উড়ে এসে লোকটার মুখের ওপর তার ধারালো নখ বসিয়ে দিলো। বাঁদর দুটো এগিয়ে এসে যে লোকটা মিউকে বাঁধতে গিয়েছিলো তাকে দুদিক থেকে চেপে ধরলো। পুরো ব্যাপারটা এমন আচমকা ঘটে গেলো যে ও টুঁ শব্দ করার সময় পেলো না। শুধু কিকির নখের আঘাতের চোটে লোকটা কাতরে উঠলো 'উঃ' বলে।

মিউকে লোকটা ঠিকভাবে বাঁধতে পারেনি। তাই দড়িটা খুলে ফেলে দিতে মিউ-এর একটুও অসুবিধে হয়নি। ও তাড়াতাড়ি সেই দড়ি নিয়ে এগিয়ে গেলো যণ্ডামার্কা লোকটার দিকে। লোকটা পকেটে হাত দিয়ে রিভলভারটা বের করার চেষ্টা করছিল। মিউ ছুটে গিয়ে লোকটার হাত চেপে ধরতেই বাবু ঘুরে এসে তার মুখে জোরে ঘুঁষি মারলো—ঢিসুম.....দ্বিতীয় ঘুঁষিটা পেটে এসে পড়তেই লোকটা ককিয়ে উঠলো। মিউ তাড়াতাড়ি তার পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে বাবুর পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে চটপট লোকটার পা দুটো বেঁধে ফেললো। তারপর হাত দুটো পেছনে টেনে এনে আচ্ছা করে বেঁধে ওকে মাটিতে শুইয়ে দিলো। লোকটার মুখ দিয়ে তখন রক্ত ঝরছে।

বাবু ততক্ষণে গিয়ে দাঁড়িয়েছে অন্য লোকটার সামনে। বাঁদর দুটো তার দিকে তাকিয়ে এমন ভাবে দাঁত কিড়মিড় করছিলো যে লোকটা ভয়ে কাঁপছিলো। তার তখন নড়ার উপায় নেই। একা বাঁদরে রক্ষে নেই তার ওপর পাখি। ঐ পাখিটা একটু আগে ওদের সর্দারের চোখ মুখের কি হাল করেছে তা তো ও দেখেছে। মিউ বাঁদর দুটোকে ইশারা করতেই তারা লোকটার কাছ থেকে সরে গেলো। বাবু আর মিউ চটপট একই ভাবে লোকটাকে বেঁধে ফেললো।

বাবু বললো, চল লোক দুটোকে টানেলের শেষ প্রান্তে রেখে আসি। এদের দলে আর কে আছে কে জানে!

মিউ বললো, তার আগে রাজাদাদা, মোমা আর বুয়া কোথায় আছে খুঁজে দেখলে হতো না?

ঠিক বলেছিস।

বাবু এগিয়ে গেলো অন্য লোকটার কাছে। তাকে জিজ্ঞেস করলো, এই ছেলেমেয়েগুলো কোথায় আছে?

লোকটা উত্তর দিলো না। বাবু মিউকে বললো, বাঁদর দুটোকে

বল লোকটাকে চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলে কামড়াতে। আর কিকিকে বল ওর চোখ দুটো আঁচড়ে নষ্ট করে দিতে।

বাবুর কথা শেষ হলো না লোকটা হাউমাউ করে উঠলো, বলছি বলছি.....

বলো, শীগগির বলো.....

তোমাদের দলের তিনটে ছেলেমেয়ে আছে ঐ কোণের ঘরে। আর তার উল্টো দিকে আছে অন্য ছেলেমেয়েগুলো।

বাঁদুর দুটো আর কিকিকে সেখানে পাহারায় রেখে বাবু আর মিউ দৌড়ে গেলো কোণের ঘরটার দিকে। তালা নয় শিকল তোলা ছিলো ঘরটায়। বাবু খুলে ফেললো। ওরা ঘরে ঢুকে দেখলো রাজা, মোমা আর বুয়াকে বেঁধে ফেলে রেখেছে ওরা। ওদের মুখে কাপড় গোঁজা।

মিউ তাড়াতাড়ি ওদের মুখ থেকে কাপড় বের করে নিলো। মোমা ওয়াক-ওয়াক করতে শুরু করলো। বাবু তখন দড়িগুলো খুলছে। রাজা বললো, তোদের গলা পাচ্ছিলাম। বুঝছিলাম তোরা লড়ছিস। কিন্তু দেখছিস তো ডাকার উপায় ছিলো না।

বাবু বললো, চল, অন্য ছেলেমেয়েগুলোকে উদ্ধার করতে হবে।

তার আগে লোক দুটোকে টানেলের শেষে রেখে এলে হতো না? মিউ জিজ্ঞেস করলো।

বাবু বললো, সেই ভালো।

ওদের বেঁধে রেখেছিস নাকি? রাজার জিজ্ঞাসা।

হ্যাঁ! চল দেখতে পাবি। বাঁদর আর কিকি পাহারা দিচ্ছে।

ওরা গিয়ে দেখলো লোক দুটো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সর্দারের মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে।

ওরা একজনের পা ধরে টানতে শুরু করলো। সর্দারকে টেনে নিয়ে চললো বাঁদর দুটো। ওদের খুব উৎসাহ। টানতে টানতেই দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখাচ্ছে। কিকি উড়ে চলেছে আগে আগে। মাঝে মাঝে বলে উঠছে, দুষ্টু লোক দুটোকে মারো....খুব মারো....

টানেলের এক কোণে অন্ধকার মতো একটা জায়গার দু দিকে লোক দুটোকে ওরা শুইয়ে দিলো। আরো ওপাশে অন্য লোকগুলো বাঁধা আছে।

মিউ বললো, ঐ নোংরা ন্যাকড়াগুলো নিয়ে আয় যেগুলো তোদের মুখে গোঁজা ছিলো—সেগুলো এ দুটোর মুখে গুঁজে দেবো। তাহলে আর কথা বলতে পারবে না। ওদের দলের কেউ এলেও চেঁচিয়ে সাহায্য চাইতে পারবে না।

বুয়া ছুটে গিয়ে ন্যাকড়াগুলো নিয়ে এলো। রাজা বললো, মোমা আয়, ওরা যেভাবে আমাদের মুখ বন্ধ করেছিলো আমরাও ঠিক সেইভাবেই ওদের মুখে ন্যাকড়া ঢুকিয়ে দিই।

মোমা বললো, না বাবা, আমি পারবো না।

আমি দিচ্ছি। বুয়া এগিয়ে গেলো।

বাঁদর দুটোকে পাহারায় রেখে ওরা চললো অন্য ছেলেমেয়েগুলোকে উদ্ধার করতে। একদম শেষের দিকের ঘরটায় তালা দেওয়া। বাবু বললো, লোকটা যা বলেছিলো তাতে তো এই ঘরটাই হবে।

মিউ বললো, তাই তো মনে হচ্ছে। আচ্ছা দাঁড়াও একটা কাজ করা যাক। কিকি ওপরে উঠে ঐ ফাঁক দিয়ে দেখে আয় তো ঘরের মধ্যে কেউ আছে কিনা?

কিকি ফাঁকা জায়গাটায় গিয়ে বসেই চিৎকার করে উঠলো, অনেকগুলো ছেলেমেয়ে শুয়ে আছে।

বাবু বললো, তালা ভাঙতে হবে।

কি করে ভাঙবি?

বুয়া এক কাজ কর, এই লাইনে ঘরগুলো দেখতে দেখতে যা। একটা ঘরে দেখবি রান্নার ব্যবস্থা আছে। খিচুড়ি রান্না করাও আছে। ওখানে লোহার কিছু আছে কিনা দ্যাখ।

বুয়া চলে গেলা। একটু পরে একটা হাতুড়ি হাতে নিয়ে ফিরে এলো। তারপর তালা ভাঙা তো কয়েক মুহূর্তের কাজ। তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে ওরা থমকে দাঁড়ালো। আট দশটা ছেলেমেয়ে মেঝেতে নির্জীবের মতো পড়ে আছে। ওরা ঘরে ঢুকতেই ভয়ে ভয়ে তাকালো। কথা বলার সাহস নেই ওদের। হঠাৎ রাজার চোখ পড়লো একটা ছেলের ওপর।

আরে ঐ তো সন্তু। বাবু মনে পড়ছে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে সন্তু হারিয়ে গিয়েছিলো।

ওদের দেখে সন্তু খুব আস্তে আস্তে বললো, বাবুদাদা, রাজাদাদা তোমরা?

আর ভয় নেই সন্তু। দুষ্টু লোকগুলোকে আমরা মেরে ধরে বেঁধে রেখেছি।

ওরা প্রথমে বুঝতে পারেনি ছেলেমেয়েগুলোর হাত পা বাঁধা। বুয়াই প্রথমে দেখতে পেয়েছিলো। ও তাড়াতাড়ি গিয়ে বাঁধন খুলে দিতে লাগলো। বাবুর পকেটে একটা ছুরি ছিলো। চটপট তাই দিয়ে দড়ি কেটে দিতে লাগলো। ছেলেমেয়েগুলো অনেকদিন ধরে বাঁধা আছে। তাই পা নাড়তে পারছিলো না। বাবু বললো, হাত পা আচ্ছা করে নাড়তে শুরু করো। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। সন্তু উঠে বসেছিলো। ওর চোখে মুখে ভয় ভয় ভাব। বাবু গিয়ে ওকে দাঁড় করিয়ে দিলো। সন্তুর পায়ে জোর ছিলো না। পড়ে যাচ্ছিলো। রাজা ধরে ফেললো। মিউ, বুয়া আর মোমা ওদের হাত পা টিপে দিচ্ছিলো। একটু পরেই ওরা উঠে দাঁড়িয়ে হাত পা নাড়তে লাগলো।

সন্তু বললো, বাবুদাদা বড্ড খিদে পেয়েছে।

চল ও ঘরে দেখেছি খিচুড়ি রান্না করা আছে।

আজও খিচুড়ি! জানো রাজাদাদা, রোজ দু বেলা আমাদের ঐ ঠাণ্ডা খিচুড়ি খেতে হয়।

মিউ বললো, এখন খেয়ে নাও। পরে ভালো খাবার খাওয়াবো।

একটু করে খিচুড়ি খেয়ে ওরা ওপরে উঠে এলো। কয়েকটা বাঁদর বসেছিলো। ওদের দেখে এগিয়ে এলো। বাঁদরকে এগিয়ে আসতে দেখে ওরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো। মিউ বললো, ভয় পেও না। ওরা আমাদের বন্ধু। ওদের জন্যই তোমাদের উদ্ধার করতে পেরেছি।

সন্তু বললো, উদ্ধার তো করেছো, কিন্তু আজ রাত্তিরেই নাকি আমাদের নিয়ে যেতে জাহাজ আসবে।

সে কী! কে বললো?

ওদের কথাবার্তায় শুনেছি।

সন্তুর কথা শুনে ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। এ আবার কি সর্বনেশে খবর! জাহাজে কতজন থাকবে কে জানে! তাদের হাতে তো অস্ত্র থাকবে। তা ছাড়া রাত্তিরবেলায় বাঁদরগুলোর হেল্প পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। মোমা ভয় ভয় গলায় বললো, এবার কি হবে বাবুদাদা?

চল তাঁবুতে যাই। ভাবতে হবে।

ওরা তাঁবুতে ফিরে এলো। তাঁবুর মধ্যেটা এলোমেলো। দুষ্টু লোকগুলোর কাজ। বাঁদররা যে কলার কাঁদিটা এনে দিয়েছিলো সেটা এক কোণে পড়ে আছে। মিউ এক ছড়া ছিঁড়ে নিয়ে তাঁবুর বাইরে যেতে যেতে ছেলেমেয়েগুলোকে বললো, তোমরাও খাও। আমি বন্ধুদের দিয়ে আসি। ওরাও সকাল থেকে খাটছে। নিচে তো দুটো বাঁদর সর্দার আর তার শাকরেদকে পাহারা দিচ্ছে। ওদেরও কলা দিয়ে আসতে হবে।

ছেলেমেয়েগুলো তাঁবুর বাইরে বসে কলা খাচ্ছিলো। কিকি উড়ে এসে তাদের সামনে বসে গলা ফুলিয়ে বললো, অনেক হয়েছে, এবার পড়তে বসো.....

ওরা অবাক হয়ে কিকির দিকে তাকিয়েছিলো। অতো সুন্দর দেখতে কাকাতুয়া ওরা দেখেনি কখনো। আর এই রকম পরিষ্কার কথা বলতেও কখনো কোনো পাখিকে শোনেনি। ওদের বিস্ময় দেখে মিউ হাসলো। বললো, কিকি কি রকম লড়ে জানো! নিচে গিয়ে যদি সর্দারের মুখটা দেখো তাহলেই বুঝতে পারবে।

ও যে পড়তে বসতে বলছে। আমাদের বই খাতা কিচ্ছু নেই। পড়বো কি করে? একটা বাচ্চা মেয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বললো।

ছাড়ো তো ওর কথা! ইচ্ছে করলে এখন খেলতে পারো। তবে জলের ধারে একদম যাবে না। বড় বড় কুমীর আছে।

বাবু আর রাজা তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো। মিউকে বললো, কি করা যায় বল তো? আজ রাত্তিরে যদি ওদের জাহাজ আসে তাহলে কি হবে? ওদের সঙ্গে লড়াই করে আমরা কি পার পাবো?

আমিও তো সেই কথাই ভাবছি। একটা কাজ করলে হয় না?

কি?

আমাদের একটা লাল চাদর আছে। একটা কিছুতে বেঁধে চাদরটা নদীর ধারে টাঙিয়ে দিলে কি হয়?

তাতে কি লাভ? মোমা জিজ্ঞেসা করলো।

লাল মানে তো ডেঞ্জার। বি.এস.এফ বা অন্য কেউ দেখলে বুঝতে পারবে এখানে কেউ বিপদে পড়েছে। সাহায্য করতে আসতে পারে।

আইডিয়াটা মন্দ নয়। এদিকে কিন্তু বেশি লঞ্চ-টঞ্চ আসে না।

একটা চান্স তো নেওয়া যেতে পারে। কমলদা আমাদের ছেড়ে গিয়ে একবারে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না। মনে হয় দূর থেকে এই দ্বীপটার ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

মিউ-এর কথা শেষ হতেই বাবু বললো, তাহলে দেরি করিসনে, এখনই চল!

বুয়া তাঁবুর মধ্যে গিয়ে ব্যাগ থেকে লাল চাদরটা বের করে আনলো। মিউ-এর নির্দেশে দুটো বাঁদর গিয়ে একটা গাছের

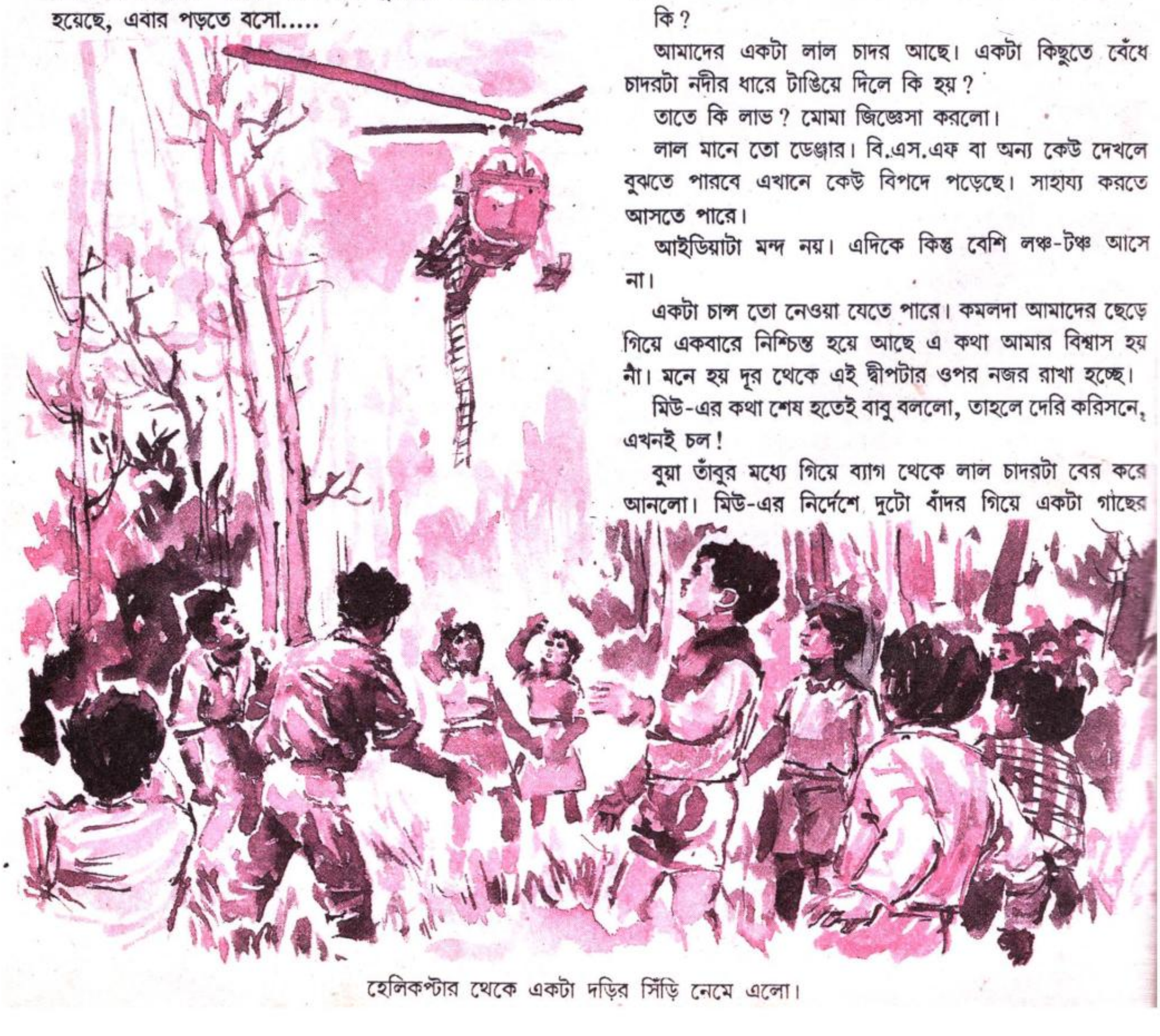

হেলিকপ্টার থেকে একটা দড়ির সিঁড়ি নেমে এলো।

ডাল ভেঙে নিয়ে এলো। তাঁবুতে দড়ি ছিলো, দড়ি দিয়ে ডালটার সঙ্গে চাদরটা বেঁধে ওরা নদীর ধারে এলো। বাচ্চাগুলোও সঙ্গে এলো। নদী তো নয় যেন সমুদ্র। যেমন চওড়া, তেমনি ঢেউ। ওরা একটা জায়গায় ডালটা ভালো ভাবে পুঁতে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে চাদরটা পতপত করে উড়তে লাগলো।

বাবু বললো, এখন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। কটা বেজেছে রে মিউ ?

মিউ-এর হাতে নতুন ঘড়ি। জন্মদিনে ওর মা কিনে দিয়েছেন। মিউ ঘড়ি দেখে বললো, পৌনে একটা...

তাহলে অনেকটা সময় আছে।

মিউ বুয়ার দিকে ফিরে বললো, তুই যা না। খিদে পাচ্ছে যে। চটপট কিছু রেঁধে ফেল। বাচ্চাগুলোও খাবে। আমরা আজ না হয় কাল এখান থেকে চলে যাবো। কিপটেমি করিস না!

বাচ্চাগুলো নদীর ধারে মনের আনন্দে খেলছিলো। ওরা শুয়ে পড়েছিলো। কাল রাত্তির থেকে ওদের বড্ড টেনশান গেছে। কেউই ঘুমোতে পারেনি। সকাল থেকে মিউ-এর শারীরিক ও মানসিক চাপ খুবই বেশি পড়েছে। কিন্তু সে সব ওদের মাথায় নেই। ওরা ভেবে পাচ্ছে না, এখন কি করবে। আজ রাত্তিরেই জাহাজ আসবে। তখন কি হবে ? ওরা গুণ্ডা বদমায়েশগুলোর সঙ্গে কতোক্ষণ আর লড়তে পারবে ? একটা নৌকোও যদি থাকতো ভেসে পড়তো। নদী থেকে ঝড়ো হাওয়া ভেসে আসছিলো। লাল চাদরটা উড়ছিলো। হঠাৎ মোমা বলে উঠলো, ঐ দ্যাখো একটা স্টিমার যাচ্ছে।

ওরা লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। সত্যিই একটা স্টিমার। তবে অনেক দূর দিয়ে যাচ্ছে। ওরা লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে হাত নাড়তে লাগলো স্টিমারের লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। কিন্তু একটু পরেই স্টিমারটা চোখের আড়ালে চলে গেলো। ওরা হতাশ হয়ে বসে পড়লো। ঠিক তখনই বুয়া এসে ওদের খাবার জন্য ডাকলো।

তাঁবুর বাইরে ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা। ওরা মাটিতেই বসে পড়লো। কলাপাতার ওপর গরম ভাত, মাখন, পাঁপড় ভাজা দিয়ে গেলো বুয়া। ছেলেমেয়েগুলো এমন ভাবে খেতে লাগলো যেন কতোকাল কিছু খায়নি। অথচ একটু আগেই ওরা খিচুড়ি খেয়েছে। সন্তু বললো, কতোদিন পরে মনে হচ্ছে যেন বাড়ির খাবার খাচ্ছি।

বুয়া বললো, ডিমের তরকারিও আছে।

আনন্দে হৈহৈ করে উঠলো ছেলেমেয়েগুলো । কিন্তু বাবু, রাজা, মিউরা তখন ভীষণ চিন্তায়। ওরা ভেবে পাচ্ছে না, বাচ্চাগুলোর এই আনন্দ ওরা কতোক্ষণ বজায় রাখতে পারবে! সময় যতো কাটছে ওদের টেনশান ততোই বাড়ছে। ভয়, ভাবনা আর আশঙ্কায় ওরা অস্থির হয়ে পড়ছে।

মিউ বললো, যদি কোনো ব্যবস্থা না হয় তাহলে দুষ্টু লোকগুলোকে আমরা বাইরের গুহা মতো জায়গায় টেনে নিয়ে গিয়ে রাখবো। আমরা কোথাও লুকিয়ে থাকবো। তার চারপাশে বাঁদরগুলোকে রাখবো। জাহাজ থেকে নেমে কাউকে খুঁজে না পেয়ে ওরা যদি ওদিকে যায়ও, বাঁদরদের দেখে হয়তো আর এগোবে না।

রাত্তিরটা হয়তো এইভাবে পার পাওয়া যাবে। কিন্তু কাল সকালে ?

বাবুর কথা শেষ হতেই মিউ বলে উঠলো, এখন থেকে ও সব ভেবে ভেবে মাথা খারাপ করার দরকার নেই। কাল সকালে যা হোক একটা কিছু করা যাবে। আমাদের হাতে অনেক সময় আছে।

আবার ছেলেধরার পাল্লায় পড়বো না তো ? মোমা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো।

ওর কথার কেউ উত্তর দিলো না। ততোক্ষণে সকলের খাওয়া হয়ে গেছে। ওরা দল বেঁধে নদীর ধারে চলে এলো। কিকি বসেছিলো একটা বাঁদরের কাঁধে। কিকিকে কাঁধে নিয়েই বাঁদরটা ছুটলো ওদের পিছু পিছু।

নদীর ধারে শুয়ে গল্প করতে করতে ওরা ঘুমিয়ে পড়লো। কাল রাত্তিরে ঘুম-টুম হয়নি। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ওদের চোখ বুঁজে এলো। বাচ্চাগুলো ওদের ঘুমোতে দেখে একটু সরে গিয়ে খেলছে। বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। নদীর জলে উথালপাতাল ঢেউয়ের সঙ্গে তাল দিয়ে বাতাস বইছে হুহু করে। হঠাৎ একটা জোরালো যান্ত্রিক শব্দে ঘুম ভেঙে গেলো। চোখ মেলতেই দেখতে পেলো একটা হেলিকপ্টার দ্বীপের অনেক নিচে নেমে এসেছে। ওরা চটপট উঠে দাঁড়ালো। বাচ্চাগুলো খেলা ভুলে তাকিয়ে আছে আকাশে। হেলিকপ্টার নামার মতো জায়গা এই দ্বীপে নেই। তাই নামতে পারছে না। কিন্তু নেমে এসেছে অনেক নিচে। হঠাৎ দেখা গেলো হেলিকপ্টার থেকে একটা দড়ির সিঁড়ি নেমে এলো। ওরা চোখ বড় বড় করে দেখছে। তারপরই ওরা আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। কমলদা দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন। কমলদা মাটিতে পা দিতেই ওরা ছুটে গেলো। ততোক্ষণে আরো একজন নেমে এসেছে। হেলিকপ্টারটা একটু ওপরে উঠে গিয়ে চক্কর দিতে লাগলো।

কমলদার মুখে হাসি। বললেন, কিরে, তোরা রেড সিগন্যাল দিয়েছিস কেন ?

কমলদার চোখ লাল চাদরটার ওপর। মিউ জিজ্ঞেস করলো, তুমি জানলে কি করে ?

ঐ তো! তোরা কি ভাবছিস তোদের এখানে ছেড়ে গেছি বলে কোনো খবর রাখছি না ! অনেক দূর থেকে একটা স্টিমার রোজই দুবার তিনবার তোদের ওপর নজর রাখতো। আজই তাদের নজর পড়েছে রেড সিগনালের ওপর। বাইনোকুলারে দেখেছে তোদের হাত নাড়ার ঘটা। ওরা সঙ্গে সঙ্গে আমায় এস.ও.এস. করেছে। আমিও চলে এলাম। এবার বল ব্যাপারটা কি! কিন্তু ঐ ছেলেমেয়েগুলো কোথা থেকে এলো ?

ওরাই তো ছেলেধরার পাল্লায় পড়েছিলো।

তার মানে ?

বাবু আর মিউ কমলদাকে সব কথা খুলে বললো। টানেলের মধ্যে দুষ্টু লোকগুলো বাঁধা আছে। বাঁদররা তাদের পাহারা দিচ্ছে। আজ রাত্তিরে জাহাজ আসবে। সব কথা শোনার পর কমলদা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কমলদার সঙ্গে যে লোকটা নিচে নেমেছিলো তাকে ডেকে বললেন, তুমি এক্ষুণি হিঙ্গলগঞ্জে চলে যাও। ওখানে

স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসার আর পুলিশরা আছে। ওদের এক্ষুণি এখানে আসতে বলো। অন্তত পঞ্চাশজন যেন আসে। যাও। কুইক।

লোকটা রুমাল নেড়ে ইশারা করতেই হেলিকপ্টারটা অনেকটা নেমে এলো। লোকটা সিঁড়ি বেয়ে চটপট ওপরে উঠে গেলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হেলিকপ্টারটা উড়ে গেলো। কমলদা বললেন, চল, নিচে গিয়ে সব দেখা যাক।

হঠাৎ কিকি উড়ে এসে বসলো কমলদার কাঁধে। গলা ফুলিয়ে বললো, অতো বড় ওটা কি পাখি?

পাখি?

হেলিকপ্টারের কথা বলছে।

মিউ-এর কথা শেষ হলো না। সকলে হেসে উঠলো। গল্প করতে করতে ওরা টানেলের মুখে গিয়ে দাঁড়ালো। সেখানে চারটে বাঁদর পাহারা দিচ্ছিলো। মিউ ইশারা করতেই ওরা সরে গেলো। টানেলে নেমে কমলদা ঘুরে ঘুরে সব দেখলেন। লোকগুলোকে দেখলেন। সর্দারের কাছে দুটো বাঁদর ছিলো। মিউ ইশারায় বুঝিয়ে দিতেই তারা টানেল ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। কমলদার নির্দেশ মতো ওরা গুণ্ডাদের সব অস্ত্র কুড়িয়ে নিলো। চারদিকটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার সময় হঠাৎ একটা ঘর থেকে 'বিপ...বিপ...বিপ...'শব্দ শোনা গেলো।

কমলদা ছুটে গেলেন। তারপরই শোনা গেলো কমলদার গলা, অল ক্লিয়ার....ওভার ....জিরো আওয়ার্স...ওভার...

ওরা দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিলো। কমলদা এসে বললেন, রাত বারোটার সময় জাহাজটা আসবে।

ওরা ওপরে উঠে এলো। ওপরে উঠতে উঠতেই হেলিকপ্টারের শব্দ ওদের কানে এসেছিল। উঠে এসে দেখল হেলিকপ্টার থেকে আবার দড়ির সিঁড়ি নেমে এসেছে। আর সেই সিঁড়ি বেয়ে একজনের পর একজন সশস্ত্র পুলিশ দ্বীপে নামছে। কমলদাকে দেখে একজন অফিসার এসে স্যালুট করে দাঁড়ালেন। কমলদা বললেন, আপনার ফোর্স নিয়ে ওপাশে টানেলে গিয়ে গুণ্ডাগুলোকে তুলে এনে হেলিকপ্টারে করে এখনি হিঙ্গলগঞ্জে পাঠিয়ে দিন। এই অস্ত্রগুলো ওদের। গুণ্ডাগুলোকে হাসনাবাদ থানার ওসির জিম্মায় দিয়ে আপনি এখনই চলে আসবেন। বি.এস.এফ কম্যান্ডারকে জানাবেন, রাত একটার সময় ওরা যেন এসে যায়।

অফিসার স্যালুট করে চলে গেলেন। কমলদা ওদের দিকে ফিরে বললেন, তোরাও হিঙ্গলগঞ্জে চলে যা না। রাত্তিরে আরামে ঘুমোবি।

বাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, তুমি পাগল হয়েছো। শেষ না দেখে এখান থেকে নড়ছি না।

শেষ আর কি দেখবি, তোরাই তো সব কাজ করে রেখেছিস। রাত্তিরে হয়তো একটু লড়াই হবে। এখানে থাকলে তোদের কিন্তু টানেলের মধ্যে থাকতে হবে। তোরা থাকলে বাচ্চাগুলোও থাকুক। কাল তোদের সুন্দরবন দেখাতে নিয়ে যাবো।

বাঘ দেখতে পাবো? মিউ জিজ্ঞেস করলো।

দেখা যাক।

সন্ধ্যে গড়িয়ে আসছে। সূর্য ডুবু ডুবু। হেলিকপ্টারটা আরো বার দুয়েক ঘুরে গেছে। গুণ্ডাগুলোকেও নিয়ে গেছে। বুয়া'র রান্নাও হয়ে এসেছে। ওরা খেয়েদেয়ে টানেলের মধ্যে চলে গেলো পেছন দিকের একটা ঘরে ওরা জমিয়ে গল্প করছে। কমলদা সারা দ্বীপের গাছপালার আড়ালে আড়ালে পুলিশকে লুকিয়ে রেখেছেন। নিজে ঘুরে ঘুরে সব দেখছেন। রাত বাড়ছে। চারদিক নিস্তব্ধ। জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ছাড়া শোনা যায় শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। জোনাকিরা আলো দেখায়। বাঁদররা গাছে গাছে নিজেদের বাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে রাত-জাগা কোনো পাখির তীক্ষ্ণ চিৎকার নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দেয়।

ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে ঘুরতে বারোটা ছুঁই ছুঁই। রাজা, মোমা, বুয়াও বাচ্চাগুলোর পাশাপাশি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাবু ইশারা করলো, মিউ উঠে দাঁড়ালো। তারপর দুজনে পা টিপে টিপে গিয়ে দাঁড়ালো টানেলের মুখে। এখান থেকে নদী দেখা যায় না। জাহাজটা কোথায় আসবে কেউ জানে না। তাই দ্বীপের চারদিকে প্লেন ড্রেসের পুলিশ ঘাপটি মেরে বসে আছে। বাবু আর মিউ পায়ে পায়ে এগোলো। একটু এগোতেই একটা আলোর ঝলক হঠাৎ যেন দেখতে পেলো ওরা। আলোটা জ্বলেই নিভে গেলো। বাবু বললো, জাহাজটা আসছে।

মিউ বললো, আর একটু এগিয়ে চলো তাহলে দেখতে পাবো।

ওরা আরো খানিকটা এগিয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালো সেখান থেকে নদীটা আবছা দেখা যাচ্ছে। ওরা পরিষ্কার দেখতে পেলো একটা বড় স্টিমার এসে দাঁড়িয়ে আছে। নদীর ধারে দুজন দাঁড়িয়ে। তারপরই একটা ছোট নৌকো এসে থামলো নৌকো থেকে চারজন লোক লাফিয়ে নেমে ডাঙায় দাঁড়ানো লোকগুলোর দিকে এগিয়ে এলো। ডাঙার লোক দুটো পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলো। তাদের পেছনে আসছে চারটে লোক জঙ্গলের কাছাকাছি আসতেই আট দশজন লোক এসে চকিতে চেপে ধরলো চারটে লোককে। ওরা অস্ত্র বের করার ফুরসৎই পেলো না। অস্ত্র কেড়ে নিয়ে ওদের চারজনকে লোকগুলো টানতে টানতে নিয়ে গেলো।

ওদিকে দশ বারোজন পুলিশ ততোক্ষণে নৌকোটা নিয়ে চলে গেছে জাহাজে। সেখান থেকে গোলমাল, চেঁচামেচির পাশাপাশি দু একটা গুলির শব্দ ভেসে এলো। আর একটা নৌকো নিয়ে আরো দশ জন চলে গেলো জাহাজে। খানিকক্ষণ পরে জাহাজের হেড লাইট জ্বেলে তারা জানিয়ে দিলো—অপারেশন সাকসেসফুল

একটার আগেই এসে গেলো বি.এস.এফের স্টিমার। তাতে তুলে দেওয়া হলো দুষ্টু লোকগুলোকে। বেশির ভাগ পুলিশ আর অফিসাররাও উঠে পড়লেন স্টিমারে। বাবু বললো, আর দেরি করিসনে মিউ। তাড়াতাড়ি চল। কমলদা নির্ঘাৎ আমাদের দেখতে আসবে। না পেলে হৈচৈ শুরু হয়ে যাবে।

বাবু আর মিউ তাড়াতাড়ি টানেলে ফিরে রাজা, মোমাদের পাশে শুয়ে পড়লো। একটু পরেই দেখা গেলো কমলদা এসে দাঁড়ালেন ঘরে। ওদের ঘুমোতে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ওপরে উঠে গিয়ে ওদের তাঁবুতে ঢুকে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লেন।

মিউ বললো, কাল তাহলে আমরা বাঘ দেখতে যাচ্ছি।

সেই রকমই তো কথা। বাবু হাসলো।

সমাপ্ত

ছবিঃ বিজন কর্মকার

ছাঁচু ঘোষের বাবা পাঁচু ঘোষের কুমন্ত্রণায় দুঃখীরামের পোষা ভূত শান্তিরাম তেঁতুলতলার তেঁতুল গাছ ছেড়ে পালিয়ে গেল। সে একা নয়। সঙ্গে আছে পাঁচু ঘোষও। কিন্তু পালাবে বললেই পালানো যায় না। ভূতো মিঞার জাল ছড়ানো আছে চারদিকে। সে ভূতের ব্যবসা করে। ভাল করেই জানে কিভাবে ভূতদের পোষ মানাতে হয়। ভূতো মিঞা তো আর ফ্যাক্টরিতে ভূত তৈরি করে না। তাকেও ভূত ধরতে হয়। আর ভূত ধরা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। বরং বেশ শক্ত।

সেদিন মঙ্গলবার। ভূত ধরতে বেরোল ভূতো মিঞা। শনি, মঙ্গলবারে ভূতেরা বেরোয় আদাড়ে বাদাড়ে। সাধ করে নয়, ভূতের স্টক কমে যাচ্ছে। সামনের মাসেই কম করে হাজার পাঁচেক ভূতের অর্ডার আছে। ডিমান্ড বেশি। সাপ্লাই কম। ভূতের দাম বেড়েছে ঠিকই, তবু বিক্রি বেশি হলে লাভও বেশি হবে। ভূতো মিঞা তাই ভূত ধরতে বেরোয়। সঙ্গে কত রকম যন্ত্রপাতি।

দুঃখীরাম-শান্তিরাম

মণিলাল মুখোপাধ্যায়

বড় সাঁড়াশি গোটা দুয়েক। একটা বোড়। ছোট সাঁড়াশি তিনটে। হাতুড়ি। মুগুর। নাইলনের বড় জাল। বোয়াল ধরার পোলো। স্নাইরেঞ্জ। লোহার চেন গোটা পাঁচেক। দুটো বড় নিশ্ছিদ্র কাঠের সিন্দুক। শুঁটকি মাছের চার। সব কিছু গরুর গাড়িতে চাপিয়ে ভূতো মিঞা বেরিয়ে পড়ল। তেপান্তর থেকে দূরে সুগলমপুরে এসে গাড়ি থামল। ভূতো মিঞা নামল। নির্জন আমবাগানে শুঁটকি মাছের চার ছিটোল। তারপর কিছুটা সরে এসে গায়ে একটা কালো কম্বল জড়িয়ে হাতে একটা নাইলনের জাল নিয়ে চুপ করে বসে রইল।

একটু পরে ঘূর্ণি উঠল। ভূতো মিঞা বুঝতে পারল শুঁটকি মাছের গন্ধে ভূত আসতে শুরু করেছে। মাছ এলে ভুড়ভুড়ি কাটে। ভূত এলে ঘূর্ণি ওঠে। একটা দুটো তিনটে। ভূতো মিঞা জাল নিয়ে ওঠে। শুঁটকি মাছ ওড়ে। ভূতো মিঞা জাল ছোঁড়ে। তারপর হুটপাট। দাপাদাপি। লাফালাফি। ভূতো মিঞা ধীরে ধীরে জাল টানে। কাছে, আরও কাছে। ভূতো মিঞা এক হাতে জাল ধরে, অন্য হাতে সাঁড়াশি নেয়। জাল ছিঁড়ে যায় বুঝি। ভূতো মিঞা সাঁড়াশি রেখে মুগুর নেয়। তারপর দমাদম। সব ঠাণ্ডা। জাল ঝাড়তেই তিন-তিনটে ভূত। ভূতো মিঞা টপাটপ ধরে, আর সিন্দুকে পোরে। হঠাৎ একটা ভূতের দিকে চোখ পড়ে। আরে! এ আবার এল কি করে! কি যেন নাম? শান্তিরাম।'

ধরা পড়ল শান্তিরাম। সঙ্গে ছাঁচু ঘোষের বাবা পাঁচু ঘোষ, আর একটা নতুন ভূত নাম গুপী। সদ্য ধর্মরাজ্য থেকে এসেছে। স্বেচ্ছায় নয়। বিচারে পাঁচশ বছর গ্রহান্তর। বিনা লাইসেন্সে ক্ষুর, কাঁচি নিয়ে স্বর্গে গিয়েছিল। কিভাবে গিয়েছিল সেই কথাই বলি।

গুপী ছিল নাপিত। মহানাদে থাকত। ওর বাবা ছিল খুব গরীব। বড় হয়ে চাকরিবাকরি করে গুপী অবস্থা ফেরায়। সে হয়ে ওঠে একজন। কিন্তু গুপী জাতব্যবসা ছাড়ল না। একটা সেলুন ছিল। সকাল সন্ধ্যেয় নিজেই ক্ষুর, কাঁচি ধরত। একদিন গুপীর এক বন্ধু বেড়াতে বেড়াতে ওর সেলুনে এসে হাজির। দেখল গুপী চুল কাটছে। বন্ধু বলল, 'আর কেন, বয়স হয়েছে। এবার ব্যবসা ছেড়ে দাও।'

গুপী বলল, 'চাকরি ছাড়ব, তবু ক্ষুর, কাঁচি ছাড়তে পারব না।'

হাসতে হাসতে বন্ধু বলল, 'দুদিন পরে তো সব কিছুর মায়া ছাড়তে হবে। ক্ষুর কাঁচি নিয়ে তো আর স্বর্গে যেতে পারবে না।'

চুল কাটছিল গুপী। হঠাৎ হাত থেমে গেল। সত্যিই তো। একথা তো সে আগে ভাবেনি! সুখে ছিল গুপী। দুঃখ এল। রাত নেই, দিন নেই, ঘুম নেই, খাওয়া নেই, এক চিন্তা গুপীর। স্বর্গে তো ক্ষুর কাঁচি নিয়ে যাওয়া যাবে না। ভাবতে ভাবতে গুপীর থোড়ের মতো চেহারাটা পাটকাঠির মতো হয়ে গেল। যে কটা চুল কাঁচা ছিল সাদা হয়ে গেল।

শীতকাল। রাত একটা। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। সবাই লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। গুপী বিছানায় ছটফট করছে। হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল গুপী।

খিল খুলে বাইরে এল। এর পর গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল। মিনিট দশেক হাঁটার পর এল পুরনো শিব মন্দিরের পিছনে। আরও কিছুটা পথ এগোল। সামনে দীঘি। চারপাশে গাছ। অন্ধকার আরও গাঢ়। আরও নিবিড়। সূচীভেদ্য। গুপী ঘাটের কাছে গেল। সিঁড়ির পর সিঁড়ি ভেঙে নামল দীঘির জলে। জল নয়, যেন বরফ। সব রক্ত বুঝি জমে যাবে। যাক, তবু সে থামবে না। জলে নামল গুপী। শেষে একগলা জলে, দাঁড়িয়ে রইল সব ভুলে।

সকাল হলো। লোকজন এল। সব দেখল। কেউ বলল, 'গুপীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।' কেউ বলল, 'নাপিত মরে জলে ভাসে, তা দেখে কাক হাসে।'

সারা পোষ, মাঘ মাস গুপী এই ভাবে কাটাল। সারারাত এক গলা জলে। ঘুম, কাজকর্ম সকাল হলে। চোত-বোশেখে সূর্যি যখন লকলকে জিভ দিয়ে পৃথিবীর দেহ চাটছে, সবকিছু খাক হয়ে যাচ্ছে, মাটি আর ফুটি এক, গুপী তখন একগলা গরম জলে দাঁড়িয়ে থাকে সারাটা দুপুর। এভাবে মানুষ কতদিন বাঁচতে পারে? গুপীও বাঁচল না। তবে গুপী মারা যাবার আগে এক কাজ করল। ক্ষুর, কাঁচি আর একটা আয়না দেহের কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখল। মৃত্যু আসে আসুক, তবু ক্ষুর, কাঁচি সে ছাড়বে না।

গুপী মারা গেল। যমদূত এল। গুপীকে বলল, 'চল।'

গুপী শুধলো, 'কে তুমি?'

'যমের দূত।'

গুপী সব বুঝতে পারল। ক্ষুর, কাঁচি, আয়না সঙ্গে নিল। যমদূত বলল, 'ওসব কি নিচ্ছ? রেখে দাও সব। এখান থেকে কিচ্ছু নিয়ে যাওয়া যাবে না।'

গুপী বলল, 'সব কিছুই তো রেখে যাচ্ছি। শুধু এই ক্ষুর, কাঁচি আর আয়নাটা নিচ্ছি।'

যমদূত বলল, 'তা কি করে হয়? আজ যদি তুমি ক্ষুর, কাঁচি নিয়ে যাও, কাল সবাই টাকা, পয়সা, গয়না-গাঁটি নিয়ে যেতে চাইবে। না না, ওসব হবে না। তাছাড়া যমরাজের প্রাসাদে ঢোকার আগে চেকিং হয়। কাস্টমসের কি কড়াকড়ি!

'বড্ড বাড়াবাড়ি', গুপী বলল।

'ধরা পড়লে আমার চাকরি তো যাবেই, তোমারও কম শাস্তি হবে না। ওসব ফেল। তাড়াতাড়ি চল।'

গুপী কি ভাবল। তারপর বলল, 'ইস্! তোমার মুখের কি ছিরি। এক মুখ দাড়ি।'

গুপী আয়নাটা ধরল যমদূতের সামনে। তার ওপর চোখ পড়তেই আঁতকে ওঠে যমদূত, 'ওটা কে গো? কি কদাকার মুখ।'

গুপী বলল, 'ওটা তুমি। তবে ভেব না, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

গুপী ক্ষুর, কাঁচি বের করে চুল কেটে, দাড়ি, গোঁফ কামিয়ে যমদূতকে কার্তিক বানিয়ে দিল। তারপর বলল, 'দেখ, চিনতে পার কি না।'

যমদূত খুব খুশি। গুপী শুধোয়, 'তা হলে যমদূত ভাই, ক্ষুর, কাঁচি নিয়ে স্বর্গে যাই।'

যমদূত একগাল হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই যাবে। হাত ধর। মন্ত্র পড়।'

'মন্ত্র পড়লে সবাই যমরাজের কাছে যেতে পারবে?'

'হ্যাঁ। তবে সবাই তো মন্ত্রটা জানে না। এবার চুপ কর। চোখ বন্ধ কর। মন্ত্র পড়—

দ্রুম—দ্রাম—দ্রুম
ফট—ফট—ফটাস
সাঁ—সোঁ—স্যাঁৎ
দ্রুম—দ্রাম—ফটাস
ভট—ভট—ভটাস।

গুপী মনে মনে মন্ত্রটা আওড়াল। সঙ্গে সঙ্গে সব অন্ধকার। চারদিকে ভোঁ ভোঁ শব্দ। গুরুগম্ভীর। মানুষ নেই। জনপ্রাণী নেই। গুপী নেই। যমদূত নেই। গ্রহ নেই। নক্ষত্র নেই। ভূত নেই। ভগবান নেই।

'চোখ খোল।'

গুপী চোখ খুলল।

যমদূত বলল, 'সামনে যমরাজের প্রাসাদ। আমার ডিউটি শেষ।'

যমদূত চলে গেল।

গুপী অবাক চোখে চায়। ভয়ে ভয়ে যায়। এখন যেই না যমরাজের প্রাসাদে ঢুকতে গেল, অমনি একটা বিকটাকার প্রহরী কর্কশ গলায় চিৎকার করে ওঠে, 'সাবধান!'

গুপী বলল, 'ভেতরে যাব।'

'ডেথ সার্টিফিকেট?'

'ডেথ সার্টিফিকেট!

প্রহরী বলল, 'শ্মশানঘাটের সার্টিফিকেট।'

গুপী বলল, 'ওটা যে ওখানে দরকার।'

'অরিজিন্যাল কেন? জেরক্স কপি মৃতের সঙ্গে অ্যাটাচ করে দিতে হবে। এই একটা কারণে কোটি কোটি লোকের বিচার বাকি। পৃথিবীর সকলের এটা জানা দরকার।'

গুপী শুধোয়, 'ওটার কি প্রয়োজন?'

'মৃত্যু অনুযায়ী বিচার। স্বাভাবিক মৃত্যুর বিচার এক। সুইসাইড কেস হলে তার বিচার আলাদা।'

'আগেও কি এত কড়াকড়ি ছিল?'

'না। আগে সবাই সত্যি কথা বলত। মুখের কথা শুনে বিচার হতো। কিন্তু এখন না। কি করে বিশ্বাস করবে! এই তো গত

বছর একজন এসে বলল, তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। সে ধোওয়া তুলসী পাতা। আরে বাবা কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দেওয়া যায়! বড়বাবু মানে চিত্রগুপ্তবাবুর কিরকম সন্দেহ হলো। বিচার বন্ধ রইল। ইনভেস্টিগেশন শুরু হলো। তারপর দেখা গেল লোকটা দশ দশটা খুন করেছে। তারপর সেও খুন হয়।'

গুপী বলে, 'যমদূত যেরকম তাড়া লাগিয়েছিল জেরক্স করার সময় হলো না।'

'ঠিক আছে, ধর্মশালায় অপেক্ষা কর।'

গুপী যাচ্ছিল, হঠাৎ আয়নাটা হাত থেকে মাটিতে পড়ল। ছুটে এল প্রহরী। এরপর সে এক বিশ্রী ব্যাপার। শেষে কাস্টমস অফিসার ওকে তুলে দিল সীমান্তরক্ষীদের হাতে। সেখানে বিশেষ আদালতে আয়না আনার অপরাধে ওর শাস্তি হলো। একশবার গরম তেলে ডোবাবে আর তুলবে। তাই হলো। কিন্তু গুপীর কিছু হলো না। হবে কি করে! ও তো মর্ত্যে রীতিমতো ট্রেনিং নিয়েছিল। বিচারক অবাক! এ রকম তো হয় না। শাস্তি পাল্টানো হলো। ওকে বরফের ঘরে আটকে রাখা হলো। দুদিন পরে দেখা গেল গুপী ঘরের ভেতর নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। কাস্টমস গুপীকে যমরাজের প্রাসাদের রক্ষীর হাতে তুলে দিল। গুপী কিন্তু ক্ষুর আর কাঁচিটা লুকিয়ে রেখেছে। ওগুলো কেউ দেখতে পায়নি। প্রথম প্রহরীর চোখে ধুলো দিলেও দ্বিতীয় প্রহারীর কাছে ধরা পড়ে গেল।

প্রহরী বলল, 'ওগুলো কি?'

গুপী বলল, 'ক্ষুর, কাঁচি।'

'ও সব নিয়ে যাওয়া যাবে না।'

গুপী বলল, 'তোমার মুখের কি ছিরি গো। এক মাথা চুল। এক মুখ দাড়ি। তবে ভেব না, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

গুপী ক্ষুর, কাঁচি বের করে প্রহরীকে ফুলবাবু বানিয়ে দিল।

'কি সুন্দর! তোমাকে যে চিনতেই পারা যাচ্ছে না। তাহলে প্রহরী ভাই, ক্ষুর, কাঁচি নিয়ে স্বর্গে যাই?'

'আমি কি করে বুঝব? আমি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছি?'

'আয়নাটা যে ওরা কেড়ে নিল। ওটা থাকলে দেখতে তোমাকে কিরকম দেখাচ্ছে।'

প্রহরী বলল, 'ঠিক আছে। ওটা নিয়ে আসছি। কিন্তু শুনে রাখ, যদি দেখি যে আমি আগের মতো আছি, তাহলে তোমার সব কিছু কেড়ে তো নোবই, আবার সীমান্তরক্ষীদের হাতে তুলে দোব।'

প্রহরী গেল আর এল। হাতে আয়নাটা। গুপী আয়নাটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে বলল, 'এবার দেখ। চিনতে পার?'

প্রহরী বলল, 'বাঃ! বাহ্বা বাঃ! এটা আমিই তো?'

'একশবার তুমি', বলল গুপী, 'তাহলে প্রহরী ভাই, ক্ষুর কাঁচি নিয়ে স্বর্গে যাই?'

নতুন লোক নিয়োগ করল নাকি?

প্রহরী বলল, 'যাই বলতে নেই। বল, আসি।'

'তাহলে আসি।'

'আসি বলে কাশী যেও না। আয়নাটা নিয়ে মাঝে মধ্যে এস।'

'ক্ষুর, কাঁচি নিয়ে আবার ঝামেলা হবে না তো?'

'হতেই পারে। হতেই পারে। আরও অনেক জায়গায় চেকিং হবে।'

'তাহলে কি হবে ভাই?'

এমন সময় নারদ এসে হাজির। 'নারায়ণ। নারায়ণ।'

প্রহরী বলল, 'ওঁকে ধর। একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

নারদ প্রহরীর কাছে এল। প্রহরীর দিকে তাকিয়ে অবাক! 'ধর্মরাজ নতুন লোক নিয়োগ করল নাকি? কোটি কোটি বছর ধরে যাকে দেখছি সে কোথায়?'

প্রহরী বলল, 'আমিই সেই।'

'তুমি! এত ঝকঝকে-চকচকে!'

প্রহরী বলল, 'এই লোকটার জন্যে।'

নারদ দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলে, 'আমাকেও বিশ্রী দেখায়, তাই না! পাঁচশ কোটি বছর দাড়ি কামাইনি। চুল কাটিনি।'

গুপী বলল, 'ঠাকুর আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।'

গুপী চুল, দাড়ি পরিষ্কার করে নারদকে যুবক বানিয়ে দিল।

নারদ খুব খুশি। বলল, 'কি বর নিবি?'

গুপী বলল, 'ঠাকুর, যেখানেই যাই, যেন ক্ষুর, কাঁচিগুলো

পাই।'

নারদ গুপীর কানে কানে ফিসফিস করে কি সব বলল। তারপর 'নারায়ণ নারায়ণ' বলতে বলতে চলে গেল।

প্রহরী বলল, 'তোমাকে একবারে মহারাজের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

গুপী যমরাজের কাছে এল। দেখল সেখানে অনেকে হাজির। মহেশ্বর, নারায়ণ, যমরাজ, ইন্দ্র, কার্ত্তিক, গণেশ, আরও অনেকে। নারদ তো আছেই।

গুপী আসতেই নারদ বলল, 'এই সেই লোক, প্রভু।'

এরপর সে এক বিশ্রী ব্যাপার। হুড়োহুড়ি, ছুটোছুটি, ধাক্কাধাক্কি, গুঁতোগুঁতি। সবাই বলে, 'আগে আমার।'

নারদ গুপীকে ইশারা করতেই গুপী ক্ষুর বাগিয়ে এগিয়ে এল। বলল, 'প্রভুরা, আপনারা লাইনে দাঁড়ান। আমি এক একজনকে ধরব।'

আবার সেই হুড়োহুড়ি, গুঁতোগুঁতি, ধাক্কাধাক্কি। সবাই আগে দাঁড়াতে চায়।

গুপী বলল, 'ঠিক আছে। আপনারা যেভাবে দাঁড়িয়ে আছেন দাঁড়ান। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

নারদ গুপীকে আবার ইশারা করে কি জানাল। গুপী বলল, 'আমি সকলকে চুল ছেঁটে, গোঁফ দাড়ি কামিয়ে যুবক বানিয়ে দেব, কিন্তু আমায় একটা লাইসেন্সের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।'

সবাই একসঙ্গে বলে ওঠে, 'কিসের লাইসেন্স ?'

'ক্ষুর, কাঁচি আর আয়না সঙ্গে রাখার লাইসেন্স।'

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। সবাই বলে, 'ঠিক আছে, কাজ দেখি, তারপর একটা ব্যবস্থা করা যাবে।'

গুপী শুরু করে। নারদ ইতিমধ্যে কেটে পড়েছে। নারদ একবারে ব্রহ্মার কাছে। 'নারায়ণ নারায়ণ।'

ব্রহ্মা ধ্যান করছিল। চোখ মেলে চাইল। 'নারদ কি ব্যাপার!'

'সর্বনাশ হয়েছে পিতামহ। স্বর্গ আর স্বর্গ থাকে না বুঝি। মর্ত্যের একটা মানুষ মরার পর ক্ষুর, কাঁচি নিয়ে স্বর্গে এসেছে।'

'সে কি, ধর্মরাজ কোথায় ?'

'লাইনে দাঁড়িয়ে।'

'তাহলে নারায়ণের কাছে যাও।'

'তিনিও লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন।'

'মহেশ্বর ?'

'লাইনে।'

'চল, দেখি।'

ওদিকে গুপী সব দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে প্রত্যেকের দাড়ি, গোঁফ অর্ধেকটা কামিয়েছে এমন সময় ব্রহ্মা হাজির। ব্রহ্মাকে রেখে নারদ লক্ষ্মী, পার্বতী, শচী দেবীকে খবরটা দিতে গেল।

ব্রহ্মা বলল, 'ছিঃ! ছিঃ! এ কি অনাসৃষ্টি। কাস্টমসকে এড়িয়ে ধর্মরাজ্যে ক্ষুর, কাঁচি! তুই ফড়িং হ।'

গুপী ফড়িং হয়ে গেল। এবারে দেবতারা সবাই ব্রহ্মাকে বলল, 'প্রভু আমাদের অর্ধেকটা করে দাড়ি গোঁফ কামিয়েছে লোকটা, অর্ধেকটা রয়েছে। আমরা দেব-দেবীর কাছে মুখ দেখাব কেমন করে? লোকটাকে ক্ষমা করুন।'

এই সময় নারদ লক্ষ্মী, পার্বতী, শচী সব দেবীদের নিয়ে হাজির। সঙ্গে সঙ্গে মহাদেব এদিকে ছোটে, নারায়ণ ওদিকে ছোটে, ইন্দ্র আর একদিকে। সবাই মুখ লুকোতে চায়। নারদ মিটিমিটি হাসে।

লক্ষ্মী, পার্বতী সবাই স্বামীদের দুর্দশা দেখে ব্রহ্মাকে ধরল, 'প্রভু, একটা উপায় করুন।'

ব্রহ্মার কৃপায় আবার সব কিছু ঠিক হয়ে গেল। গুপী ক্ষুর কাঁচি নিয়ে অর্ধসমাপ্ত কাজ শেষ করল। ব্রহ্মা মহেশ্বর, নারায়ণ, ইন্দ্র সকলের মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'বাঃ! বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে তো! এখানে একজন ক্ষৌরকার দরকার। ইন্দ্র তুমি একটা বিজ্ঞাপন দাও।'

নারদ বলল, 'বিজ্ঞাপনের আর কি দরকার প্রভু। গুপীকেই ঐ পদে নিয়োগ করুন।'

ব্রহ্মা বলল, 'তাই হবে। তবে বিনা লাইসেন্সে ক্ষুর, কাঁচি নিয়ে এখানে আসার অপরাধে ওকে মর্ত্যে তেপান্তরে গিয়ে পাঁচশ বছর ভূত হয়ে থাকতে হবে। তারপর মুক্তি। মুক্তির পর নিযুক্তি।'

গুপী ব্রহ্মাকে প্রণাম করল। মহেশ্বরকে প্রণাম করল। একে একে সকলের পায়ে মাথা ঠুকল। শেষে বলল, 'তাহলে এখন যাই, আশীর্বাদ করুন ক্ষুর, কাঁচি নিয়ে যেন স্বর্গে আসতে পাই।'

'তথাস্তু।'

তারপর থেকেই গুপী ক্ষুর, কাঁচি নিয়ে তেপান্তরে দিন রাত্তির ঘোরাফেরা করে।

ঘুরতে ঘুরতে কি মনে হলো, শুঁটকি মাছের চার খেতে এল শান্তিরাম আর ছাঁচু ঘোষের বাবা পাঁচু ঘোষের সঙ্গে। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। তিনজনেই ধরা পড়ল। ভূতো মিঞা ব্যবসাদার হলেও অসৎ নয়। শান্তিরামকে ফেরত পাঠাল দুঃখীরামের কাছে। শান্তিরামকে পেয়ে দুঃখীরাম ভালই আছে।

ছবিঃ ধ্রুব রায়

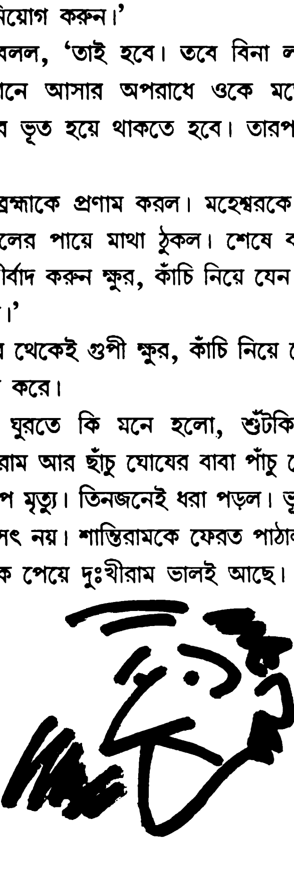

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে?

ভাদ্র মাস! তার মানে পুজোর ঢাকে কাঠি পড়লো বলে। সত্যি, কি মজা। সারা বছর আমরা তো তাকিয়ে থাকি পুজোর ঐ কটা দিনের দিকে। একটা একটা করে দিন কাটে আর মনে হয় পুজো আবার আসছে। তা সত্যিই পুজো এতোদিনে এসে গেছে। ভাদ্র মাসের শুকতারা বেরুনো মানেই তো পুজো সংখ্যা হাতে পাবার দিন এগিয়ে আসা। আর শারদীয়া সংখ্যা মানেই তো পুজো। আমরাও তোমাদের জন্যে শারদীয়া সংখ্যা প্রায় তৈরি করে ফেলেছি। ভাদ্র সংখ্যাতেই এবারের পুজো সংখ্যা কেমন হবে তার খানিকটা আঁচ পাবে। বিজ্ঞাপনটা নিশ্চয়ই দেখেছো। খুশি তো? তোমরা যে খুব খুশি সে কথা জানি, তাই এবার অন্য প্রসঙ্গে আসছি।

তোমরা তো কল্পবিজ্ঞানে পড়ো ভিন গ্রহের প্রাণীদের কথা। সত্যিই কি অন্য কোনো গ্রহে মানুষ কিংবা মানুষের চেয়ে উন্নত কোনো জীব আছে? এই নিয়ে বিজ্ঞানীরা কম ভাবনাচিন্তা করছেন না। প্রায় একশ বছর আগে জুলে ভার্নে তাঁর কল্পবিজ্ঞানের গল্প-উপন্যাসে যে সব কথা লিখেছিলেন আজ তা সত্যি হচ্ছে। সেই রকম একদিন হয়তো মহাকাশের ভিন্ন গ্রহে প্রাণের খোঁজ পাওয়া যাবে। তা বিজ্ঞানীরা কিন্তু বসে নেই। সম্প্রতি মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা, যাকে সংক্ষেপে নাসা বলা হয়, হাত দিয়েছে এই গবেষণা প্রকল্পে। এই ব্যাপারে দশ বছরের একটা কর্মসূচী তারা গ্রহণ করেছে। এই জন্য বছরে এক কোটি ডলার খরচ হবে বলে ধরা হয়েছে। লস অ্যাঞ্জেলেসের মাউন্ট উইলসনের (৫৮০০ ফুট) চুড়োয় বসে গবেষণা চালাবেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। এই জন্যে ১০০০টি নক্ষত্রকে বেছে নেওয়া হবে। প্রত্যেকটি নক্ষেত্রে পাঁচ মিনিটে দুশ বার করে দুশ কম্পাঙ্ক ব্যান্ডে বেতার সংকেত পাঠাবেন। ঐ নক্ষত্রগুলি থেকে ফিরে আসা বেতার তরঙ্গ বিশ্লেষণ করে তাঁরা বুঝতে পারবেন সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব কিংবা বুদ্ধিমান প্রাণী আছে কিনা। দেখা যাক আমাদের কল্পনা এবার সত্যে পরিণত হয় কিনা।

এবার তোমাদের কয়েকজনের চিঠির উত্তর দিই। শুকতারার বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে চিঠি লিখছো তো? আমি চাই তোমরা সকলে গর্বের সঙ্গে বলবে, আমরা শুকতারার বন্ধু। কিন্তু শুকতারার এক বন্ধু এমন একটা কাজ করে বসেছে যে লজ্জায় আমি যাই আর কি! প্রতিযোগিতার গল্পের ব্যাপারে। গত বছর শ্রাবণ মাসে প্রতিযোগিতা বিভাগে জয়দীপ দাসের যে গল্পটি ছাপা হয়েছিলো সেই গল্পটিই সামান্য একটু এদিক ওদিক করে জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠিয়েছিলো এবং সেটিই পুরস্কৃত গল্প হিসেবে বৈশাখ সংখ্যায় বেরিয়েছে। তোমরা অনেকেই এই বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছো। জানি না জয়ন্তর কোনো বক্তব্য আছে কিনা। কীই বা থাকবে! কিন্তু জয়ন্তর এই কাণ্ড দাদুমণিকে কি লজ্জায় ফেলেছে তা বোধহয় তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। এ শুধু লজ্জা নয়, বড় দুঃখের বিষয়ও। এখন যদি কেউ বলেন, দাদুমণির কাছ থেকে তোমরা এই শিখছো? তাহলে কি দাদুমণির মুখ থাকবে? আমি চাই জয়ন্ত নিজে জয়দীপকে চিঠি লিখে ক্ষমা চেয়ে নেবে। তারপর দুজনেই চিঠি লিখে আমায় সব কথা জানাবে, কেমন?

গৌতম মণ্ডল (চুঁচুড়া, হুগলি)

উত্তরঃ অনিল কুম্বলের ছবি দেওয়া ক্যালেন্ডার এবার তো আর হলো না। তবে বড় ছবি নিশ্চয়ই শুকতারায় ছাপা হবে।

পলারশন রাউৎ (c/o শ্রী পুলিন রাউৎ, গ্রাম—লক্ষ্মীকুণ্ড, পোঃ কাশীনাথপুর, জেলা—মেদিনীপুর, পিন-৭২১৪২৪)

উত্তরঃ তোমার পুরো ঠিকানা ছেপে দেওয়া হলো। তুমিও পত্রবন্ধুর জন্যে শুকতারার বন্ধুদের কাছে চিঠি লেখো।

পার্থপ্রতিম লোধ (c/o শ্রী পুলকরঞ্জন লোধ, গ্রাম—ফুলহড়ি, পোঃ কমলপুর, উত্তর ত্রিপুরা, পিন-৭৯৯২৮৫)

উত্তরঃ শুকতারার প্রত্যেকটি সংখ্যা তোমার খুব ভালো লাগে জেনে আমরা উৎসাহিত হয়েছি। তুমি নিশ্চয়ই লেখা পাঠাতে পারো। সম্পাদকমণ্ডলীর পছন্দ হলেই ছাপা হবে। যে ঠিকানায় তুমি চিঠি লিখেছো সেই ঠিকানাতেই লেখা পাঠাতে পারো।

আজ তাহলে এই পর্যন্তই। ভালো থেকো সকলে। অনেক আদর আর ভালোবাসা নাও। জয় হিন্দ।

—তোমাদের দাদুমণি

তোমাদের পাতা

সুদীপ দে, বয়স এগারো, সপ্তম শ্রেণী,
ডি. এন. এইচ. এস. স্কুল, কাছাড়, আসাম

বিদায় একশত

দিন গেল চলে
আঁধারের কোলে,
আকাশ হলো যে লাল।
অস্তের রবি
রেখে গেল ছবি,
নিয়ে গেল শত সাল।
নব প্রত্যুষে
নতুন আকাশে,
উদিত হবে সে আবার।
আকাশের কোলে
লুকোচুরি খেলে,
ছড়াবে কিরণ দিবার।
পৃথিবীর আজ
নব হলো সাজ,
পুরনোকে চির বিদায়।
মৈত্রীর বাণী
পৃথিবীতে আনি,
শান্তিকে রাখি বিশ্ব সভায়।

সুদীপ চ্যাটার্জী,
বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী,
বাঁকুড়া জেলা স্কুল

আশিস মোদক,
বয়স পনেরো, পঞ্চম শ্রেণী,
প্রতিবন্ধী কল্যাণ কেন্দ্র, হুগলী

দুর্গোৎসব

সাদা মেঘের ভেলায় ভাসা শরতের আকাশ
শিউলি ফুলের গন্ধে মাতাল হলো যে বাতাস,
দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল খুশির রোশনাই
উঠল মেতে বাঙালীর প্রাণ আর মন ভাই।
আসছে দেবী পুত্র-কন্যা সহ পিত্রালয়ে
মাঠ-ঘাট-শহর-গ্রাম আনন্দেতে ছায়,
হাট-বাজারে, দোকান-পাটে উথলে ওঠে ভিড়,
শরৎরানীর বীণার তারে শোনো খুশির মিড়।
আসছে পূজা, আসছে পূজা, আসছে পূজা তাই
লাগাম ছাড়া বাঁধনহারা হলাম যে সবাই।
এই চারদিন আমরা স্বাধীন
থাকবো নাকো কারো অধীন
চড়ব সবাই পাতাল রেল
দেখব বাতির হরেক খেল,
খেলব আমরা নতুন খেলা
দেখবে সবাই মিলন মেলা।
দুঃখ কষ্ট দূরে রেখে
উঠব মেতে নতুন সুখে,
ধনী দরিদ্র সব ভুলে ভাই
এস আমরা এক হয়ে যাই,
হবো নাকো আর কখনো ভিন্ন
মনের বাঁধন রাখি অক্ষুণ্ণ।

শেখ রূপা মুস্তাফা,
বয়স ষোল, একাদশ শ্রেণী,
ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন, কলকাতা

শেখ শবনম হোসেন, বয়স দশ, পঞ্চম শ্রেণী,
আওয়ার লেডি কুইন অফ দ্য মিশন স্কুল, কলকাতা

আশা

আমি যদি হতে পারি
একটি রাজহাঁস,
সকলেই বলবে দেখে
সাবাস সাবাস।
যদি আবার হতে পারি
একটি গোলাপ লাল,
ভরিয়ে দিতাম সুবাস দিয়ে
ঐ গাছেরই ডাল।
আবার যদি হতুম আমি
একটি ছোট পাখি,
কিচিমিচি শব্দ করে
ডালে ডালে ডাকি।
আশা অনেক করে গেলাম
মিটলো নাকো মোটে,
এমন আশা মেটার নয়
যা আছে তাই ঘটে॥

নমিতা পাহাড়ী,
বয়স পনেরো, নবম শ্রেণী,
বৈতাবাজার হাই স্কুল,
মেদিনীপুর

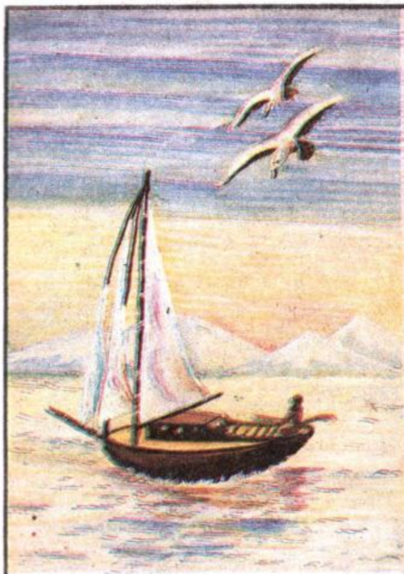

শোভনলাল দপ্তরী, বয়স সতেরো, দশম শ্রেণী, শক্তিনগর উচ্চ বিদ্যালয় কৃষ্ণনগর

স্বাধীনতা দিবসের উদ্দেশে

স্বাধীনতা আনতে গিয়ে
করলো যারা মৃত্যু বরণ,
আগস্টের এই শুভ দিনে
তাদের মোরা করছি স্মরণ।
বিদেশীদের কবল থেকে
আনতে মায়ের মুক্তি,
সেদিন যারা করেছিল
মৃত্যুর সাথে চুক্তি,
শ্রদ্ধা তাদের জানাই মোরা
সবাই মিলে একসাথে,
বিপ্লবীদের রক্তে ধোওয়া
স্বাধীনতার এই প্রাতে।

অনীক আইচ
বয়স চোদ্দ, অষ্টম শ্রেণী,
বালিভড়া সরস্বতী বিদ্যামন্দির,
উত্তর চব্বিশ পরগনা

অরুণকুমার ঘোষ, বয়স সাত, প্রথম শ্রেণী, বিবেকানন্দ শিশুনিকেতন পাঠভবন, বৈলাপাড়া, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

মহুয়া মুখার্জী, বয়স চোদ্দ, নবম শ্রেণী, মডেল ইংলিশ হাইস্কুল, সিঁথী

রজনীগন্ধা

ও রজনীগন্ধা তুমি
গন্ধ যখন ঢালো,
আঁধার রাতে ফুলবাগানে
ছড়ায় কিসের আলো?

বৃষ্টি যখন ঝরঝরিয়ে
ফুলগুলিকে নাড়ায়,
তোমার রূপের বাহার তখন
দুই চোখে ঘুম তাড়ায়।

অনন্যা দত্ত,
বয়স বারো, ষষ্ঠ শ্রেণী,
রমেশচন্দ্র উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়,
শ্রীরামপুর।

সুদেষ্ণা চৌধুরী,
বয়স চোদ্দ, অষ্টম শ্রেণী,
সেন্ট পলস্ গার্লস স্কুল,
দুর্গাপুর, বর্ধমান

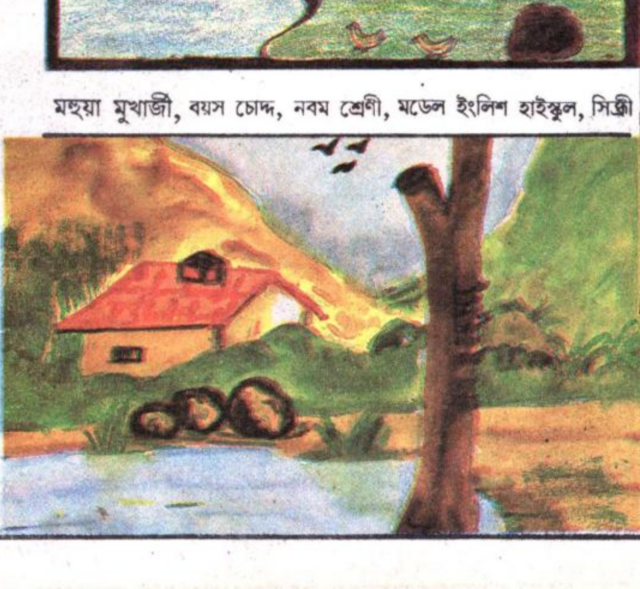

কৌশিক চ্যাটার্জী,
বয়স পনেরো, নবম শ্রেণী,
রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ বিদ্যালয়,
আসানসোল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নিখিলদা হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল!
ইস্‌স্‌! হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল!
এখনই গুন্ডাটা ছুরি চালিয়ে ওকে খুন করবে।
তপেন দাদাকে সাহায্য করতে ছুটে যাচ্ছিল; — দেবাশিস বাধা দিল...
শান্ত হও, তপেন। তুমি ওখানে যেও না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো — নিখিলদাকে কেউ মারতে পারবে না।
এইবার তোকে পেয়েছি।
ওয়াও উ উ ... ইঁয়্যাংসুম!
কিসের শব্দ ?.. ওটা কী!
৮-6
(চলবে)

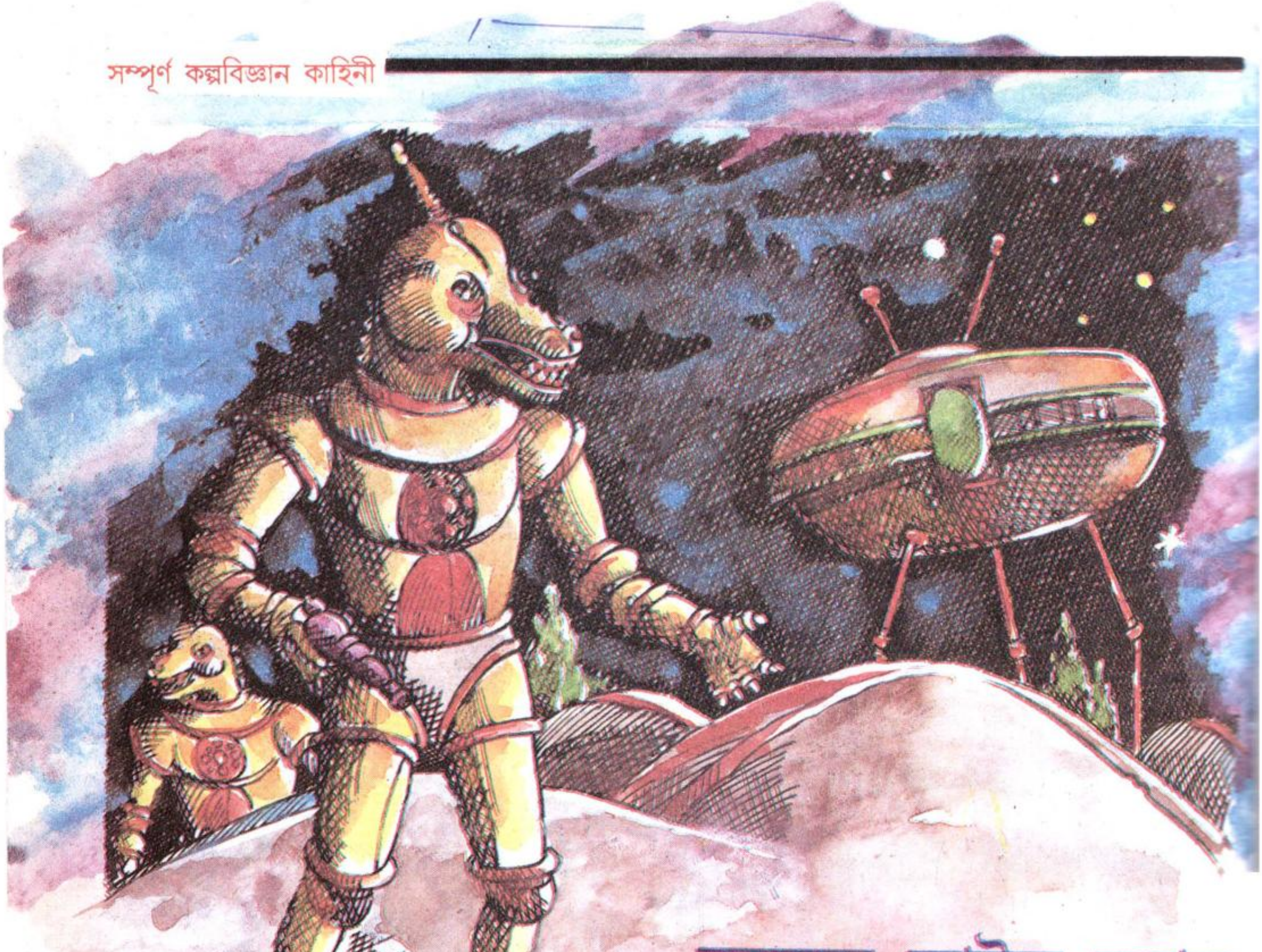

কসমস ফাইভ বনাম ডেল্টা টোয়েন্টি এইট

ডাঃ দেবব্রত রায়

॥ এক ॥

আমাদের মহাকাশযান প্রস্তুত। প্রজেক্টের সিনিয়র অফিসার ডঃ মহালনবীশ শেষবারের মতো যানটি পরীক্ষা করে ফিরে এলেন। কন্ট্রোল রুমে তখন আমি, আমাদের অভিযানের শারীরতত্ত্ব বিশারদ ডঃ বোস, ভূতত্ত্ববিশারদ ডঃ শেঠনা আর আবহাওয়া ও বেতার বিশেষজ্ঞ মিস অনামিকা চক্রবর্তী গভীর আগ্রহে বসে। সবার সামনে বসে আছেন প্রজেক্ট ডিরেক্টর ডঃ তালুকদার। চুপচাপ থাকলেও বুঝতে পারছি আমাদের মতো উনিও উত্তেজনায় টানটান। তাঁর প্রশস্ত কপালে ফুটে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

কন্ট্রোল প্যানেলের লাল আলো দেখে বোঝা গেল এখন সময় বারোটা। আমাদের মহাকাশযানে তেমন কোনো যান্ত্রিক গণ্ডগোল ধরা পড়েনি। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াও প্রতিকূল নয়। তাই এর মধ্যে কোনো অঘটন না ঘটলে পূর্ব নির্ধারিত ভারতীয় সময় বারোটা বত্রিশ মিনিটেই আমাদের রওনা হবার কথা।

ফাইনাল সিগন্যাল এসে গেছে। আমাদের এবার উঠতে হবে। ডঃ তালুকদার বললেন, ডঃ রায় তোমাদের সফলতা কামনা করি। প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে ভুলবে না; আর সন্দেহজনক কিছু দেখলেই তার ছবি তুলে পাঠাবে।

কন্ট্রোল রুম থেকে বেরোতেই প্রেস কর্নার থেকে একটা গুঞ্জন ভেসে এল। সমস্ত কর্নারটাই আজ রিপোর্টার আর ফটোগ্রাফারে ভর্তি। প্রেস রিলিজ যা দেবার তা এখান থেকে ডঃ তালুকদারেরই দেবার কথা। সাংবাদিকদের বেষ্টনী পেরিয়ে

আমরা মহাকাশযানে উঠে বসলাম। পূর্ব নির্দিষ্ট সময়েই একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে আমাদের মহাকাশযান কসমস ফাইভ আকাশে উড়ল।

॥ দুই ॥

ভিউ স্ক্রিনে হিন্দুস্থান এয়ারোনেটিকস এণ্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (HASA) উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের ছবি ভেসে উঠছে। ডঃ তালুকদারকে দেখা গেল উদ্বিগ্নমুখে কন্ট্রোল রুমে টেকনিক্যাল ডিরেক্টারের পাশের চেয়ারে বসে তাঁর কমপিউটার স্ক্রিনের দিকে চেয়ে আছেন।

হ্যাল্লো ডঃ রায় কোনো চিন্তা নেই। আমি সব সময় তোমাদের দিকে নজর রাখছি। কিছু অসুবিধা হলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে।

ইয়েস স্যার।

আমাদের যান মহাকাশে প্রচণ্ড বেগে ছুটছে। ভিউ স্ক্রিনে আশেপাশের ছবি ফুটে উঠছে।

পাশ দিয়ে একটা উল্কাপিণ্ড ছুটে গেল। সেটার ছবি তুলতে তুলতে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন মিস চক্রবর্তী। এমন অনেক জিনিসের দেখা মিলবে আমাদের এই অভিযানে। কিন্তু আনন্দে আত্মহারা না হওয়ার কড়া নির্দেশ আছে ডঃ তালুকদারের। কথাটা মনে করিয়ে দিতেই একেবারে মুষড়ে পড়লেন বেচারী।

॥ তিন ॥

এ পর্যন্ত অস্বাভাবিক তেমন কিছু নজরে আসেনি। গ্রহান্তরে যাবার জন্য আমাদের এ অভিযান নয়। আমরা ইউ. এফ. ও. (আনআইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট) বা উড়ন্ত চাকি নিয়ে বেসরকারী উদ্যোগে গবেষণা করছি। সেই গবেষণার তাগিদেই আমাদের এই প্রজেক্ট। যদি নতুন কোনো আলোকপাত করা যায় এই ব্যাপারটার উপর।

আমি স্লিপিং সেলে ঢোকার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, হঠাৎ কন্ট্রোল প্যানেলের লাল বাতি জ্বলে উঠল। অর্থাৎ হাসার কন্ট্রোল রুম থেকে বিশেষ কোনো নির্দেশ আসবে। সবাই মিলে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

ডঃ রায়, আমি তালুকদার বলছি। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি কসমস ফাইভের পাঁচশ কিমি দূর দিয়ে কয়েকটা উড়ন্ত লাল চাকি তোমাদের পাশাপাশি যাচ্ছে। নজর রেখো।

কিন্তু আমরা তো রাডারে তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না। সে কথা ডঃ তালুকদারকে বলতেই প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, হোয়াট? তবে নিশ্চয়ই মারাত্মক রকমের কোনো গণ্ডগোল পাকিয়েছে। তোমরা কসমসের স্পীড কমিয়ে দাও। লেসার ঠিক রাখবে।

খানিকক্ষণের নীরবতা। মিস চক্রবর্তী ঝুঁকে পড়েছেন রাডারের দিকে। ওঁর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না।

আবার ডঃ তালুকদারের গলা ভেসে এল, এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি সেই চাকিগুলো আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। ডোণ্ট ওরি। তেমন মনে করলে লেসার ছুঁড়তে দ্বিধা করবে না। সাবধান! কেউ যেন স্লিপিং সেলে না ঢোকে।

কথা ছিল পালা করে আমরা একজন একজন স্লিপিং সেলে ঢুকে বিশ্রাম নেব। সেই সময় অন্যরা মিলেমিশে তার কাজটা চালিয়ে নেবে। কাজের সুবিধার জন্যই এ ব্যবস্থা। সেদিকে নজর রেখেই আমরা সবাই প্রায় সবার কাজই মোটামুটিভাবে শিখে রেখেছি। কিন্তু এ অবস্থায় সে আশার গুড়ে বালি। বিশেষত রাডার নিয়ে ব্যাপারটা আরো জটিল হয়ে গেল। আমাদের এই যন্ত্রটি যেমন শক্তিশালী তাতে ওর ব্যাসার্ধের মধ্যে যাই-ই আসুক না কেন আমাদের পর্দায় তাকে দেখা যাবেই আর অটোমেটিক সিস্টেমে ক্যাসেটে তার ছবিও তোলা থাকবে। এমন যন্ত্রই বিগড়েছে! এখন কী উপায় হবে! অবশ্য অত শক্তিশালী না হলেও মোটামুটি রেঞ্জের একই রকমের আরেকটা রাডার আমাদের মজুত আছে। দরকারে সেটাও কাজে লাগানো যাবে। কিন্তু ব্যাপারটা নাশকতামূলক কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তেমন হলে দ্বিতীয়টিরও একই হাল হবার সম্ভাবনা। আর তা যদি হয় তো সমূহ বিপদ।

হাসার কন্ট্রোল রুম থেকে ডঃ তালুকদারের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, ডঃ রায় আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না কেমন করে এমন হলো। এখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো একই রকমের চাকি কসমস ফাইভকে ইলিপ্টিক্যালী ঘিরে ক্রমশঃ ওর দিকে এগিয়ে আসছে। খুব সম্ভবত ওরা এক ধরনের বীম ছুঁড়ছে।

আমাদের দুটো রাডারই সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে স্যার।

ঐ বীমের জন্যই হচ্ছে।

এখন আমরা কী করবো স্যার?

ডঃ তালুকদার কি বললেন ঠিক বোঝা গেল না। হঠাৎই ওঁর কণ্ঠস্বর একেবারেই থেমে গেল। বিদঘুটে একটা বিপ বিপ শব্দ ভেসে আসছে। ডঃ মহালনবীশকে লেসার বীম শুরু করার নির্দেশ দিলাম। কিন্তু হায় সেখানেও গণ্ডগোল। শব্দটা ক্রমশ জোরালো হচ্ছে।

॥ চার ॥

তারপর আর কিছু মনে করতে পারছি না। যদ্দূর মনে পড়ছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করছিলাম বিকল রাডার আর লেসার মেশিনকে ঠিক করতে। কিন্তু আসল দোষটা যে কোথায় সেটাই ধরতে পারছিলাম না। ডঃ তালুকদারের নির্দেশ ছিল এমন ধরনের অবস্থায় পড়লে আমরা যেন সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যাই। কিন্তু মন বলছিল সেটাও আর সম্ভব হবে না। কারণ হাসার কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে আমাদের সংযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

তাছাড়া কন্ট্রোল প্যানেলের রেকর্ডিং দেখে বোঝা যাচ্ছিল কসমস ফাইভের উপর আমাদের আর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। অন্য কেউ যেন আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে।

এ পর্যন্তই পরিষ্কার মনে আছে। পরে যখন জ্ঞান ফিরল বুঝতে পারলাম পরিবেশটা সম্পূর্ণ আলাদা।

।। পাঁচ ।।

চোখ খুলে দেখি যেখানে আছি সেটা অনেকটা একটা ঘরের মতো। চারদিকেই নিরেট প্রাচীর। কোথাও জানালা-দরজা বা ভেন্টিলেটর জাতীয় কিছু নজরে এল না। দেয়ালটা যে ঠিক কি দিয়ে তৈরি ঠাহর পাচ্ছি না। সমস্ত ঘরটা জুড়ে একটা হাল্কা হলুদ আলোর আভা। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। আশেপাশেও কেউ আছে বলে মনে হলো না।

পাশ ফেরার চেষ্টা করে দেখলাম একেবারেই নড়াচড়া করা যাচ্ছে না। অথচ আমার হাত পায়ে কোনো বাঁধনও নেই। কী আশ্চর্য! মাথার দিকে নজর গেল। দেখি কিম্ভূতকিমাকার একটা মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। মাথাটা অনেকটা কুমীরের মতো। লম্বায় তিন থেকে সাড়ে তিন ফুটের বেশি কোনোমতেই হবে না। মাথার ঠিক মধ্যিখানে স্প্রিং-এর মতো প্যাঁচানো একটা অ্যানটেনা একবার এদিক একবার সেদিক দোল খাচ্ছে। বুকের কাছটাতে ফোনের ডায়ালের মতো একটা গোল যন্ত্র, তাতে নানা রঙের অনেকগুলো বোতাম। নিশ্চলভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিটা।

হঠাৎ মূর্তিটার একটা হাত আপনা থেকেই ওর বুকের কাছে উঠে গেল। উজ্জ্বল কমলা রঙের একটা বোতাম টিপে দিতেই আমার চোখের সামনে পায়ের দিকের দেওয়ালটিতে একটা ছবি ভেসে এল। হাসার ছবি। ডঃ তালুকদার হাসার কন্ট্রোল রুমে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। আমি চিৎকার করে উঠলুম, 'স্যার ডঃ তালুকদারের কোনো ভাবান্তর হলো না। বুঝলাম এখানে শত চেঁচামেচি করলেও পৃথিবী থেকে তার বিন্দুমাত্রও শোনা যাবে না। ভীষণ কান্না পাচ্ছিল নিজেদের এই অসহায় অবস্থা দেখে।

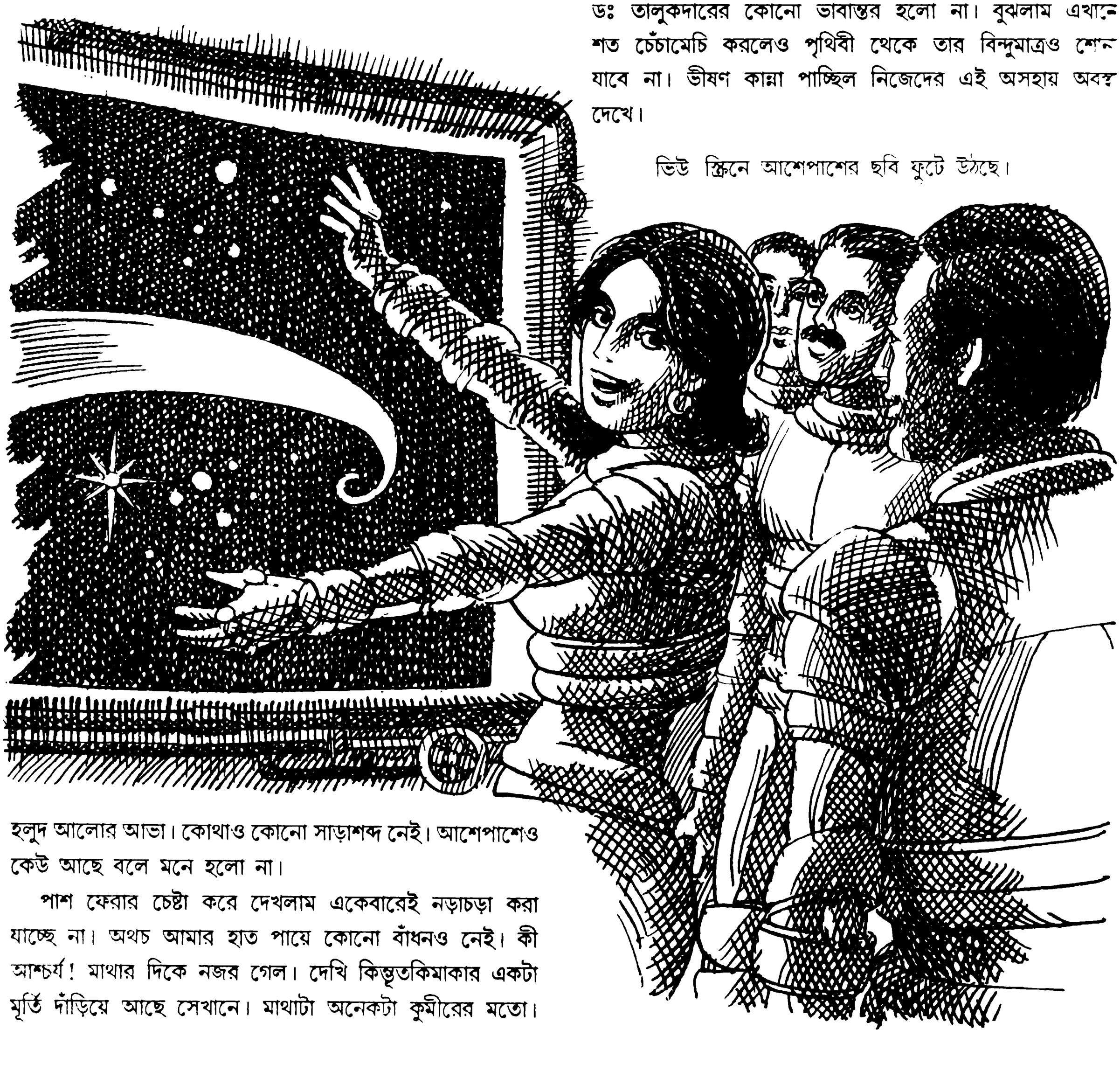

ভিউ স্ক্রিনে আশেপাশের ছবি ফুটে উঠছে।

কুমীরমুখো সেই কিম্ভূতকিমাকার মূর্তিটা এবার অন্য একটা বোতাম টিপে দিল। আস্তে আস্তে আমার সমস্ত বাঁধন খুলে গেল। বুঝলাম কোনো অদৃশ্য বাঁধনে আমাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল। ছাড়া পেয়ে উঠে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে ইংরেজীতে কেউ বলে উঠল, ডঃ রায়, বুঝতেই পারছ তোমরা আমাদের হাতে বন্দী। তুমি এতক্ষণ যেমনভাবে ছিলে, তোমার সঙ্গীদেরও তেমনিভাবে আটকে রাখা হয়েছে। আচ্ছা তোমরা আমাদের পেছনে লেগেছ কেন? আমাদের খানিকটা পরিচয় তো পেয়েই গেছ। ভয় নেই, তোমাদের আমরা মারব না। অবশ্য যদি তেমন মতের অমিল হয় তবে তো অন্যরকম ভাবতেই হবে। আশা করছি তার প্রয়োজন হবে না। কথা শেষ হতেই অদ্ভুত রকমের একটা আওয়াজ শোনা গেল।

ব্যাপারটা খানিকটা আঁচ করতে পারছি। আমরা নিশ্চয়ই এদের হাতে বন্দী। এরা কারা তা জানি না, তবে এটুকু বুঝতে পারছি বেঁচে থাকতে হলে এদের কথা মতোই চলতে হবে এখন থেকে। এ অভিযানের পরিচালনার ভার আমার হাতেই। তাই ভেবেচিন্তে জিজ্ঞেস করি, আপনি যেই-ই হোন, আমাদের এভাবে আটকে রেখে আপনার লাভ?

তোমরা আমাদের আটকাবার জন্য এত চেষ্টা চালাচ্ছ কেন? তোমাদের যন্ত্রপাতি কত নিম্নমানের এখন বোধহয় তা আর বুঝিয়ে বলতে হবে না।

কি বলতে চান?

বুঝতে পারছো না? এই যন্ত্র নিয়ে আবার এত বড়াই। আমরা এবার তিলে তিলে তোমাদের ধ্বংস করবো। প্রথমে তোমাদের, তারপর একে একে সবকটা গ্রহ আমাদের হাতে আসবে। বুঝলে?

আমি কি উত্তর দেব? সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বর আবার বলে উঠল, তোমরা তো ইন্ডিয়ার বড় বড় সব সায়েন্টিস্টস। আমাদের সঙ্গে হাত মেলাবে?

না তা কখনোই সম্ভব নয়।

তবে পচে মর। জীবনে আর তোমরা পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবে না। হাঃ....হাঃ.....হাঃ। এখানে খাবার পাবে খাবে। মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াবে। কেউ তোমাদের কিচ্ছুটি বলবে না। কিন্তু সাবধান, এখান থেকে পালাবার কথাও ভাববে না। তাহলে মরবে।

কণ্ঠস্বর থেমে গেল।

আবার সেই দমবন্ধ করা অস্বস্তিকর ভয়ানক নিঃস্তব্ধতা। কেটে গেছে অনেকটা সময়।

।। ছয় ।।

এ আমরা কোথায় এসে পড়লাম? এ কোন গ্রহ! আমার সঙ্গীসাথীরা সব কোথায়? সবাই সুস্থ আছে তো? বহুক্ষণ আছি এখানে। এখন দিন না রাত্রি কে জানে! লক্ষ্য করে দেখলাম ঐ কিম্ভূতকিমাকার যন্ত্রগুলো শুধুমাত্র সুইচ টিপে টিপে হুকুম তামিল করে যাচ্ছে। মুখে কোনো সাড়াশব্দ নেই। কেবল বুকের কাছের ডায়ালটা থেকে মাঝে মাঝে সরসর আওয়াজ হচ্ছে।

আন্দাজে বুঝতে পারছি বেশ কয়েকদিন পেরিয়ে গেছে। ডঃ মহালনবীশ, ডঃ বোস, মিস চক্রবর্তী, ডঃ শেঠনা কারো কোনো হদিস পাইনি। আমাকে সেই আগের জায়গাতেই রাখা হয়েছে। একটা ছোট্ট বাটিতে শ্যাওলা শ্যাওলা মতো কি যেন একটা পদার্থ খেতে দেওয়া হচ্ছে মাত্র একবার। অথচ আশ্চর্য ঐটুকুতেই পেট ভরে যাচ্ছে। খেতে মোটামুটি মন্দ নয়।

একঘেয়ে বন্দীজীবন কাটাচ্ছি। ওরা মাঝেমধ্যে হাসার ছবি দেখাচ্ছে। ডঃ তালুকদারকে মনে হচ্ছে আমাদের খোঁজে নতুন করে অভিযান পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন। কী আশ্চর্য! হাসার সব ঘটনা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি অথচ আমাদের অবস্থা ওঁরা জানতে পারছেন না! কুমীরমুখোগুলো বুঝতে পারছি আসলে রোবোট। একদিন বললাম, আচ্ছা, আমার আর সব সঙ্গীরা কোথায়? ও কি বুঝল জানি না, সুইচ বোর্ডের একটা সুইচ টিপে দিল। পায়ের দিকের দেওয়ালে সঙ্গে সঙ্গে মিস চক্রবর্তীর ছবি ভেসে উঠল। মিস চক্রবর্তীও আমার মতো অবস্থাতেই আছেন। সেখানেও দেখলাম মাথার কাছে একটা রোবোট দাঁড়িয়ে। একে একে প্রত্যেকের ছবি ভেসে উঠল। সবার অবস্থাই এক। কিন্তু ডঃ বোসকে দেখেই চমকে উঠলাম। ওঁর হাত দুটো সরু লিকলিকে হয়ে গেছে। ওঁদের দেখে আনন্দে নাম ধরে চিৎকার করে উঠেছি। কিন্তু ওঁরা কেউ তা শুনতে পাননি।

নব ঘোরানো শেষ করে যন্ত্রদানব আবার অন্য একটা সুইচ অন করে দিল। আবার সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বর, হ্যালো ডঃ রায়, কেমন লাগছে? দেখলে তো তোমরা সকলেই আমাদের হাতের মুঠোয়। এখন কি করবে? পালাবে? এখান থেকে পালাতে তোমরা পারবে না। তার চেয়ে বরং সুবোধ ছেলের মতো আমাদের সঙ্গে হাত মেলাও। তোমাদের পেলে আমাদের কাজটা তাড়াতাড়ি এগোয় এই আর কি। বুঝলে না। আখেরে অবশ্য তোমাদের লাভই হবে। আর মাত্র কয়েকটা দিন যেতে দাও, আমরাই হবো সমগ্র সৌরজগতের অধীশ্বর।

আমি চিৎকার করে উঠলাম, না তা হতে পারে না। আপনি কে তা জানি না ঠিকই, তবে কি উদ্দেশ্যে আমাদের এখানে এনেছেন তা না বোঝার মতো মাথামোটা আমাদের ভাবছেন কী করে? আড়ালে থেকে কথা বলার কি অর্থ তাও জানি না, কিন্তু জেনে রাখুন হিন্দুস্থান এয়ারোনেটিকস এণ্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সায়েন্টিস্টরা আপনার কাছে পরাজয় স্বীকার করার জন্য মহাকাশে আসেনি।

খুউব ভালো কথা। হাঃ....হাঃ....হাঃ তোমাদের মুরোদ দেখা

যাবে।

অদৃশ্যের ঐ উৎকট হাসি আমার কাছে অসহ্য বোধ হচ্ছে। বিরক্ত হয়ে বললাম, আপনারও তো সাহস নেই কাছে আসবার।

আবার সেই অট্টহাসি। এ জগতের যিনি অধীশ্বর, যাঁর ধারণা কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সমগ্র সৌরজগতের একচ্ছত্র অধিপতি হবেন তিনি বোধহয় এখানকার একমাত্র জীবন্ত প্রাণী।

।। সাত ।।

আমার ধারণাই ঠিক। দু দিন পর যিনি ঘরে এলেন মুখোশের আড়ালে মুখটা ঢাকা থাকলেও বুঝতে অসুবিধা হলো না ইনি মানুষ। ঘরে ঢুকেই আবার সেই গা-জ্বলানো বিকট হাসি। হ্যালো সায়েন্টিস্ট, কি ঠিক করলে?

আমি একা তো নই। আমার সঙ্গীসাথীদের মতামতও তো দরকার।

দ্যাটস কারেক্ট। তাহলে তোমাদের আজ এক জায়গাতেই রাখা হবে। তোমরা ভেবেচিন্তে দেখ কোন পথে যাবে।

আমি এরকমটাই চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম সবাই এক জায়গায় থাকতে পারলে যা হোক কিছু একটা উপায় বেরিয়ে পড়তেও পারে। আর তেমন যদি হয় তো ঐ লোকটার কথায় সাময়িকভাবে রাজী হয়ে যেতে হবে।

কেমন ভাবে আমাদের এক জায়গায় আনা হলো মনে নেই। শুধু একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছিল। ঘুম ভাঙতেই দেখি সবাই এক জায়গায়। অনেকদিন পর অন্যদের ফিরে পেয়ে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। কেউ কাউকে দেখতে না পাওয়ায় সবারই দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। আমরা তো জানতাম না কার ভাগ্যে কি ঘটেছে। সবাইকে মোটামুটি সুস্থ অবস্থায় ফিরে পেয়ে তাই ভীষণ ভাল লাগল। কেবল ডঃ বোসকে দেখে কষ্ট হলো। হাত দুটো একেবারেই নাড়তে পারছেন না। ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ডঃ বোস, আপনার হাত অমন হলো কি করে?

ডঃ বোস ফিসফিস করে বললেন, ডঃ রায়, সে আর বলবেন না। আমরা যেখানে এসে পড়েছি সেখানে মানুষ মাত্র একজনই আছেন, অন্য সব রোবোট।

আমিও তাই আন্দাজ করেছিলাম।

আমি এটা প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলাম। ভেবেছিলাম ওদের ঘায়েল করে পালাব। কিন্তু সেটা করতে গিয়েই এই বিপত্তি। ওদের ছুঁতেই আমার হাতের সমস্ত নার্ভগুলো চিরকালের মতো অকেজো হয়ে গেছে। বলতে বলতে ওঁর চোখ ছলছল করে উঠল।

নিজেকে ভীষণ অসহায় বোধ হচ্ছে। আমরা এ কোথায় এসে পড়লাম, যেখানে মানুষ শুধু একজন কিন্তু চারপাশ ঘিরে আছে কুমীরমুখো সব রোবোট। আমাদের সবার এখন প্রশ্ন, আমরা কি এখান থেকে আর কোনোদিনও পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবো?

ডঃ মহালনবীশ এতক্ষণ কি যেন ভাবছিলেন আপনমনে। হঠাৎ বললেন, ডঃ রায় পনের বছর আগের কথা মনে আছে? ডঃ অ্যাণ্ডারসন নামে এক নভশ্চর মহাকাশে পাড়ি দিয়ে আর ফিরে আসেননি। ধরে নেওয়া হয়েছে তিনি মহাকাশ দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।

শুনেছি।

আমার কি মনে হচ্ছে জানো রায়?

কি?

আমার মনে হয় ডঃ অ্যাণ্ডারসন এখনো বেঁচে আছেন।

কথাটা অবাক করার মতোই বটে।

সে কি করে সম্ভব?

সে অনেক কথা ডক্টর। তোমরা অনেকেই জান না ডঃ অ্যাণ্ডারসন রোবোট নিয়ে গোপনে গবেষণা করছিলেন।

ব্যাপারটা রহস্যজনক ডঃ মহালনবীশ। কিন্তু আমাদের নিজেদের কথা ভাবা এখন সবচেয়ে বেশি জরুরী। আমরা এখন কিভাবে এগুবো?

আমার মনে হয় আপাতত এখানকার নির্দেশ মেনে চলাই ভালো। তাছাড়া তো আর কোনো পথ দেখছি না।

অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন যে আমরা ওর শর্ত মেনে নিয়ে এখানেই থাকি? ডঃ শেঠনা বললেন।

ঠিক তাই।

এ তো ভারী অদ্ভুত কথা!

শেষ পর্যন্ত ঐ কথাই ঠিক রইল। আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত ওদের জানিয়ে দিলাম। এর পর আমাদের সবাইকে একসঙ্গেই রাখা হয়েছে। নিজেদের ইচ্ছেমতো যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারছি। কিন্তু ওদের অধিপতি আর একটি বারের জন্যও আমাদের কাছে আসেনি। তবে কি ও বুঝতে পেরেছে যে তার আসল পরিচয় আমরা আঁচ করে ফেলেছি?

।। আট ।।

যেখানে আছি সেটা কোন গ্রহ তা জানি না। চারদিকে দশ-বারো ফুট উঁচু উঁচু অসংখ্য টিলা। লালচে ধরনের তাদের রঙ। তার খাঁজে খাঁজে ক্যাকটাস জাতীয় দু'চারটে গাছগাছড়া নজরে পড়ে। অদ্ভুত ধরনের কিছু প্রাণী রয়েছে এখানে। অনেকটা গিরগিটির মতো দেখতে কিন্তু আকারে তার চতুর্গুণ। সারা গায়ে ছোট ছোট রোঁয়া মতন। চোখের পাতায় লম্বা লম্বা চুল। নীলচে নীলচে গায়ের রঙ। কয়েকটা জলাশয়ও চোখে পড়েছে। দেখে মনে হয় জলের গভীরতা তেমন বেশি নয়। জলের রঙ কালো। ডঃ শেঠনা সেই জল সংগ্রহ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বাধা দিলেন ডঃ মহালনবীশ। বললেন, জলটা যে বিষাক্ত নয়, তাইবা কে

বলতে পারে? এখানেও পৃথিবীর মতোই দিন হচ্ছে রাত হচ্ছে, কিন্তু দিনের স্থিতিকাল কম।

আমাদের ইচ্ছে ছিল এখানকার সমস্ত কিছুর নমুনা গোপনে সংগ্রহ করব। কিন্তু অজানা আশঙ্কায় গাছপালা প্রাণী কোনো কিছুই স্পর্শ করার সাহস হয়নি।

এক রাতে ডঃ শেঠনাকে প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা ডক্টর, এটা কোন গ্রহ বলে আপনার মনে হচ্ছে?

ঠিক উত্তর দিতে পারলেন না উনি। এখানে প্রাণী আছে যখন তখন অক্সিজেনও আছে প্রচুর পরিমাণে এ কথা নির্দ্বিধায় ধরে নেওয়া যেতেই পারে। তাছাড়া আমরাও এখানে কোনোরূপ শ্বাসকষ্ট অনুভব করছি না। অবশ্য কোনো আর্টিফিসিয়াল সোর্স থেকে এই অক্সিজেন সাপ্লাই হচ্ছে কিনা কে জানে!

মিস চক্রবর্তী বললেন, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন স্যার, এখানকার আকাশে কিন্তু মেঘের দেখা মিলছে না একেবারেই। ভাববার মতো ব্যাপার বটে। একজন মানুষ এখানে কি করে এমনভাবে বেঁচে আছে! প্রতিদিন আমাদের যে খাবার দেওয়া হচ্ছে সেটা কি জিনিস?

ডঃ মহালনবীশ বললেন, আমার ধারণা ওটা ক্লোরেল্লা জাতীয় উদ্ভিদ থেকে তৈরি করা।

সে তো বুঝলাম, কিন্তু আপনি কি নিঃসন্দেহ যে এটা অ্যাণ্ডারসনেরই কীর্তি?

দেখো রায়, ওকে আমি যতটা চিনি তাতে আমার পক্ষে ভুল হওয়াটা খুব স্বাভাবিক নয়। তাছাড়া ও তো একটিবারের জন্যও মুখোশ ছাড়া এখানে অসেনি। তাই ওর মুখ আমরা দেখতে পাইনি। তাতেই আমার সন্দেহ আরো বাড়ছে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এটা ঐ অ্যাণ্ডারসন ছাড়া আর কেউ নয়।

আপনি কি ডঃ অ্যাণ্ডারসনকে দেখেছেন ডঃ মহালনবীশ?

তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে কয়েক বছর আগে রাশিয়ায় আমাদের স্পেস সায়েন্টিস্টদের একটা কনফারেন্স হয়েছিল। তাতে ইন্ডিয়া থেকে আমাকে ডেলিগেট করে পাঠানো হয়েছিল। তখনই ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। তারপরেও দু'বার আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে। একবার কানাডায়, একবার জাপানে। তখনই কথায় কথায় রোবোট নিয়ে ওঁর ভাবনাচিন্তার কথা জানতে পেরেছি। আর এও বুঝতে পারছিলাম লোকটার মাথায় একটু পাগলামির ভাব আছে।

মেনে নিলাম উনি রোবোট টেকনোলজিতে একজন বিশেষজ্ঞ, কিন্তু এই নির্জন জায়গায় উনি রোবোট বানাবার মতো এতো সব যন্ত্রপাতি পাচ্ছেন কোথা থেকে?

সেটা আমিও ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারছি না। তুমি নিশ্চয়ই জান না ডঃ রায় যে অ্যাণ্ডারসন তাঁর মহাকাশযান ডেল্টা টোয়েন্টি এইটের নকশা নিজেই করেছিলেন। আমার সন্দেহ, তখনই কিছু কিছু মেটেরিয়ালস পাচার হয়েছে। তাছাড়া—

তাছাড়া?

তাছাড়া আমরা যেমনভাবে এখানে এসেছি তেমনভাবেও কিছু আগমন হতে পারে।

তাহলে আপনি বলতে চাইছেন যে ডঃ অ্যাণ্ডারসন যে আর ফিরে যাবেন না তা তিনি গোড়াতেই ঠিক করে নিয়েছিলেন?

আমার তো তাই-ই অনুমান।

কথা বলতে বলতে আমরা এগোচ্ছিলাম। হঠাৎ ডঃ মহালনবীশ ফিসফিস করে বলে উঠলেন, কোনো সন্দেহ নেই ডঃ রায়। এটা ডঃ অ্যাণ্ডারসন ছাড়া কেউ নয়। ঐ দেখ ডক্টর, ঐ যে, ঐ গাছটার পেছনে।

ডঃ মহালনবীশের ইশারা অনুসরণ করে গাছটার পেছনে তাকিয়ে দেখি বিশাল ত্রিভুজের মতো একটা কী যেন পড়ে রয়েছে। ডঃ মহালনবীশ আস্তে আস্তে বললেন, এই হলো সেই বিশ্বাসঘাতক ডঃ অ্যাণ্ডারসনের হারানো মহাকাশযান ডেল্টা টোয়েন্টি এইট। এই একটি মাত্র মহাকাশযান আজ সমগ্র বিশ্বের ত্রাসের হেতু। এর জন্যই হাসায় আজ এতদিন ধরে কত গবেষণা চলেছে। তার জন্যই আমরা মহাকাশে পাড়ি জমিয়ে এখানে বন্দী। কোনোদিন আর ওখানে ফিরে যেতে পারবো কিনা তাই-ই বা কে জানে?

ডঃ মহালনবীশ কানের কাছে মুখ নামিয়ে বললেন, ওদের এখনই কিছু বলো না রায়।

।। নয় ।।

তারপর বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেছে। এক সন্ধ্যায় আমি আর ডঃ মহালনবীশ বেড়িয়ে ফিরছিলাম। ডঃ মহালনবীশ বললেন, ডঃ রায় আমাদের আর কোনো ভয় নেই। বড় ধরনের অঘটন না ঘটলে আর কিছুদিনের মধ্যেই আমরা ফিরে যেতে পারবো।

তা কেমন করে সম্ভব ডঃ মহালনবীশ?

বলছি রায়। ডঃ অ্যাণ্ডারসন যত বুদ্ধিমানই হোক না কেন এক জায়গায় তিনি মারাত্মক ভুল করে রেখেছেন। আমরা ওঁর সেই ভুলেরই সুযোগ নেব।

সেটা কি রকম?

ডঃ মহালনবীশ বললেন, ডঃ অ্যাণ্ডারসন এই অজানা গ্রহে এসে আপন জগতকে নিজের মনের মতো করে চালাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু যে মহাকাশযানে করে এখানে এসেছিলেন সেটাকে নষ্ট করেননি। এর যান্ত্রিক কলাকৌশল আমারও কিছু কিছু জানা আছে। কারণ ঘটনাটি ঘটবার পর এ নিয়ে পত্রপত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি হয়েছিল। আমাকেও অনেক জায়গায় লিখতে হয়েছিল এ নিয়ে। সেই সুবাদেই তখন অনেক কিছু জেনেছিলাম। আমরা ঐ মহাকাশযানে করেই এখান থেকে পালাবো। উত্তেজনায় ডঃ মহালনবীশের কণ্ঠস্বর বারবার রুদ্ধ হয়ে আসছে।

।। দশ ।।

তখন গভীর রাত। আস্তানায় আমরা সবাই জেগে রয়েছি। আমাদের সামনে জীবনমরণের প্রশ্ন। একটু ভুলচুক হলে সারাজীবন তার খেসারত দিতে হবে। আমাদের আজকের এই দুঃসাহসিক অভিযানের নেতা স্বাভাবিকভাবেই ডঃ মহালনবীশ। একসময় তিনি আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা সবাই তৈরি তো?

আমরা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। আমাদের সবার আগে রয়েছেন ডঃ মহালনবীশ। দরজা খুলে বেরিয়েই কিন্তু ভয়ানক হোঁচট খেলাম। সামনেই দাঁড়িয়ে ডঃ অ্যাণ্ডারসন। ডঃ মহালনবীশের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, বেশ ভালভাবেই জানো যে তোমরা আমার হাতে বন্দী।

তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে ডঃ মহালনবীশ কঠোর কণ্ঠে বললেন, ডঃ অ্যাণ্ডারসন, ভেবেছেন মুখোশ পরে আমার চোখকে ফাঁকি দেবেন তাই না? কিন্তু ডক্টর, আপনার মতো একজন বিজ্ঞানী পৃথিবীর সঙ্গে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করলেন কেন?

বা...বা আমার সত্যিকারের পরিচয়টাও জেনে গেছ তাহলে। তা বেশ। কিন্তু এখান থেকে পালাবার তো কোনো পথ নেই ডক্টর। তোমরা ভয়ানক ভুল করছ।

দেখুন ডঃ অ্যাণ্ডারসন, আপনার সঙ্গে কথা বলতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে। আপনি এখানকার একচ্ছত্র অধিপতি হতে পারেন, কিন্তু এখান থেকে পালাবার পথ যে আছে তা আপনি না জানলেও আমি বেশ ভালো করেই জানি।

ডঃ মহালনবীশের কথায় হেসে ওঠেন অ্যান্ডারসন।

কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায় ডক্টর? ইচ্ছে হলেই আমি আবার তোমাদের ধরে নিয়ে আসবো। তোমরা অনেক জেনে গেছ। এ অবস্থায় তোমাদের তো কখনোই ছাড়া চলবে না।

তা যা বলেছেন আণ্ডারসন। তবে শুনে রাখুন আপনার পাগলামির দিনও প্রায় শেষ হয়ে এল। নিজের জ্ঞান দিয়ে কতকগুলো রোবোট বানিয়ে সমস্ত পৃথিবীর উপর আপনি দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। আমরা আপনার নাগাল পাচ্ছি না। কিন্তু এবারে তো আপনাকে ধরা দিতেই হবে অ্যাণ্ডারসন।

বেশ বুঝতে পারছিলাম কথা বলতে বলতে অ্যাণ্ডারসন ও মহালনবীশ দুজনেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলছেন। আমরাও রুদ্ধশ্বাসে প্রহর গুনছি, কি হয়, কি হয়!

হঠাৎ পকেটে হাত ঢুকিয়ে ডঃ অ্যাণ্ডারসন রিভলবারের মতো একটা যন্ত্র বের করে আমাদের দিকে তাক করে বললেন, ডঃ মহালনবীশ, পৃথিবীতে ফিরে যাবার জন্য তো এত কাঠখড় পুড়িয়ে এখানে আসিনি। সাবধান, আর এক স্টেপও এগুবে না। তাহলে রাডার আর লেসার মেশিনের মতোই তোমাদের অবস্থা হবে।

ডঃ আণ্ডারসন, আপনার হাতের অস্ত্রে মরার জন্য আমরা এখানে আসিনি। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দেন ডঃ মহালনবীশ।

আমরা হতভম্ব। যাঁর হাতে বন্দী তাঁর রাজত্বে তাঁরই হাতের মারাত্মক অস্ত্রের পাল্লার মধ্যে দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ করার মতো মনোবল ডঃ মহালনবীশ কোথায় পেলেন? আমি আর ভাবতে পারছি না।

দাঁত কিড়মিড় করে চিবিয়ে চিবিয়ে অ্যাণ্ডারসন বললেন, ডঃ মহালনবীশ, শেষবারের মতো জানতে চাইছি তোমরা কি চাও?

ডঃ মহালনবীশ অ্যাণ্ডারসনের চোখে চোখ রেখে দৃঢ়স্বরে বললেন, আগেও যা বলেছি এখনো তাই বলছি। আপনি আমাদের আটকে রাখতে পারবেন না। আর এ-ও জেনে রাখুন আপনার দিনও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পৃথিবীর কাছ থেকে আত্মগোপন করে আর কতদিন থাকবেন ডক্টর?

সে কৈফিয়ৎ তোমায় দিতে হবে নাকি মহালনবীশ? ব্যঙ্গভরে কথাকটি বলেই ডঃ অ্যাণ্ডারসন ফায়ার করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই ডঃ মহালনবীশের হাতের একটা যন্ত্র থেকে নীলচে রশ্মি বেরিয়ে অ্যাণ্ডারসনের দিকে ছুটে গেল। স্পষ্ট দেখলাম অ্যাণ্ডারসন কাটা কলাগাছের মতো ধপ করে মাটিতে পড়ে গেলেন ডঃ মহালনবীশ যে কোত্থেকে এই অস্ত্রখানা যোগাড় করেছেন তা একমাত্র তিনিই জানেন।

বি কুইক। তাড়াতাড়ি চলো। তাড়া দেন মহালনবীশ।

আমরা সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওঁকে অনুসরণ করলাম। গোপন পথ দিয়ে এগিয়ে এসে আমরা উপস্থিত হলাম ডঃ অ্যাণ্ডারসনের পরিত্যক্ত অথচ ত্রুটিমুক্ত মহাকাশযান ডেল্টা টোয়েন্টি এইটের কাছে। তাঁর নির্দেশে একে একে সকলেই তাতে উঠে বসলাম মুক্তির আনন্দে মন তখন নেচে উঠেছে। চালকের আসনে বসেছেন ডঃ মহালনবীশ। তাঁর একপাশে আমি অন্য পাশে মিস চক্রবর্তী পেছনে রয়েছেন ডঃ বোস আর ডঃ শেঠনা।

এগারো

ডেল্টা টোয়েন্টি এইট ছুটে চলেছে। ভাগ্যদেবতা আমাদের প্রতি সুপ্রসন্নই বলতে হবে। মহাকাশযানটা অব্যবহারেও বিকল হয়নি। উত্তেজনায় কারো মুখ থেকে কথা সরছিল না। ডঃ মহালনবীশই প্রথম মুখ খুললেন, ডঃ রায় আমরা পৃথিবীর দিকে ফিরে চলেছি।

কিন্তু ডঃ অ্যাণ্ডারসন?

ওঁকে এখানেই ফেলে গেলাম। অজানা গ্রহের অধিপতি আর বেঁচে নেই। সেই সঙ্গে অকেজো হয়ে গেল এখানকার সেই কুমীরমুখো রোবোটগুলোও।

এখন থেকে তাহলে ইও. এফ. ও. সমস্যার সমাধান হলো ডক্টর।

হ্যাঁ, অনেকটা তাই।

এতক্ষণ অন্য তিনজন ব্যগ্র হয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনছিলেন

ডঃ বোস ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, আচ্ছা, ডঃ মহালনবীশ, সমস্যাটা তো আর দুদিনের নয়.....

তাহলে ডঃ অ্যাণ্ডারসনের পক্ষে এটা চালানো কি করে সম্ভব হলো সেটাই জানতে চাইবেন তো?

হ্যাঁ ঠিক তাই। ডঃ অ্যাণ্ডারসন তো মাত্র কুড়ি বছর আগেও পৃথিবীতে ছিলেন।

ডঃ বোস, আমার মনে হয় ডঃ অ্যাণ্ডারসনের আগে অন্য কোনো রোবোট-বিজ্ঞানী এটা গড়ে গেছেন। তিনি কে তা আমিও জানি না। তাঁর হাত থেকেই আমাদের অ্যাণ্ডারসন এর দায়িত্বটা পেয়েছিলেন। অ্যাণ্ডারসন নিজে থেকেই এখানে এসেছিলেন, নাকি আমাদের মতো জোর করে ওঁকেও নিয়ে আসা হয়েছিল সেটা অবশ্য রহস্য থেকে গেল। এর উত্তর দিতে পারতেন একমাত্র অ্যাণ্ডারসন। কিন্তু তিনি তো আর নেই।

ডঃ অ্যাণ্ডারসন হয়তো আমাদের ওঁর উত্তরসূরী ঠাওরেছিলেন—হাসতে হাসতে কথাটা বললেন ডঃ শেঠনা।

অনেকক্ষণ থেকে একটা কথা আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। জিগ্যেস করবো কিনা ঠিক করতে পারছিলাম না। যদ্দূর জানি ডঃ অ্যাণ্ডারসন মহাকাশবিজ্ঞান আর রোবোট বিজ্ঞানে একজন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী ছিলেন। ওঁর মতো একজন ট্যালেন্টেড বিজ্ঞানী কি করে এমন হয়ে গেলেন! শেষে আর থাকতে না পেরে জিগ্যেস করেই ফেললাম। ডঃ মহালনবীশ জানালেন, শেষদিকে ডঃ অ্যাণ্ডারসন ভয়ানক মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। সেটা কতকটা পারিবারিক কারণে, খানিকটা পেশাগত কারণে। সেই সুযোগে হয়তো কেউ তাঁকে এই অপকর্মে লিপ্ত করেছে। একজন বিজ্ঞানীর এই শোচনীয় অবস্থায় মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। আরো খারাপ লাগছিল এই ভেবে যে নিজেদের বাঁচাতে গিয়ে ওঁর মতো একজনকে মেরে ফেলতে হলো। ডঃ তালুকদারই বা ব্যাপারটাকে কেমনভাবে নেবেন কে জানে!

মিস চক্রবর্তী কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এবার তা সফল হলো।

ভিউ স্ক্রিনে হঠাৎ হাসার ছবি ভেসে এল। ডঃ তালুকদারকে দেখছি লাইব্রেরিতে একখানা বই পড়ছেন। আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম, স্যার।

ডঃ তালুকদার ঝপ করে বইটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। উনি বোধহয় কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না।

তোমরা.....তোমরা কি পৃথিবীতে ফিরে আসছো?

হ্যাঁ স্যার।

কিন্তু তোমাদের মহাকাশযান কসমস ফাইভ?

সে অনেক কথা স্যার। সব বলবো।

কিন্তু তোমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছিলে তার কি হলো?

পৃথিবীর মানুষের জন্য সুখবরই এনেছি স্যার।

দেখলাম ডঃ তালুকদার উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে চেয়ারে বসে পড়লেন। বললেন, তুমি সত্যি বলছ ডক্টর?

হ্যাঁ স্যার ইউ. এফ. ও. আর কিছুই নয় অজানা গ্রহের এক জানা অধিপতির খামখেয়ালী।

জানা অধিপতি? এ সব তুমি কি বলছ ডক্টর?

ডঃ অ্যাণ্ডারসন এ সমস্ত কিছুর হোতা, কিন্তু উনি আর বেঁচে নেই স্যার।

সে কি?

হ্যাঁ আমরা তাঁকে বাঁচাতে পারিনি।

বড্ড ভুল করেছ ডক্টর।

আমাদের কোনো উপায় ছিল না স্যার।

আমরা পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের মধ্যে এসে গেছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসার ল্যান্ডিং-এ পৌঁছে যাব।

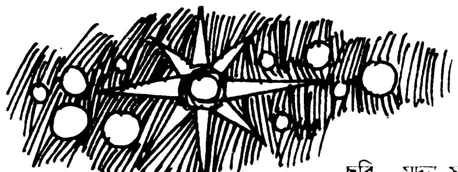

ছবি　মদন সরকার

ছাত্র-ছাত্রীদের একান্ত আপনার
সরল অভিধান
(সম্পূর্ণ পরিমার্জিত, পরিশোধিত এবং পরিবর্ধিত)
সবার মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে
দেব সাহিত্যের অনবদ্য সংকলন
অরুণ দের
হাসির হুল্লোড়
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের
দূরন্ত এক অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনী
সাহারার সন্ত্রাস
দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড
২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯

ভয়ঙ্করের মোকাবিলায় ম্যাম'জেল এক্স (শ্রাবণ সংখ্যার পর)

একমাত্র ঐ কর্পোরালটিই সার্জেন্ট বরখের অনুগত ছিলো। সে দ্রুত হল থেকে বেরিয়ে গেলো...
দেখেছো তো একমাত্র ঐ কর্পোরালটা ছাড়া আর কেউ বরখ্‌কে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। ঐ যে বলে না, বেড়াল সরে গেলে ইঁদুররা নাচে।
কিন্তু বরখ্‌ যদি কোনোভাবে এখন ফিরে আসে তাহলে কি হবে?
বলবো তুমি ক্যাবিনেটের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে। পাছে তোমার লোকরা তা জেনে ফেলে তাই আমরা তোমায় লুকিয়ে রেখেছিলাম। দেখবে ও আর আমাদের ঘাঁটাবে না। আর সেই সময়ের মধ্যেই ইংরেজ ভদ্রলোকও নিরাপদে নেমে পড়তে পারবে।
দুজনে কটেজে ফিরে এলো। পরচুলা খুলে ম্যাম'জেল তৈরি হলো বেরুবার জন্যে।
সাড়ে নটা বাজে। নিনটি, এবার ল্যান্ডিং প্লেসে যাবো। আলোটা নিভিয়ে দাও।
ম্যাম'জেল যখন সবে বেরিয়েছে...
এ কী! আমি এখানে কেন? আমার কি হয়েছে?
ম্যাম'জেল যতোক্ষণ ভেবেছিলো তার অনেক আগেই সার্জেন্ট বরখের জ্ঞান ফিরে এলো।

কর্পোরাল গিয়ে দেখলো জার্মান সৈন্যরা খাওয়া-দাওয়ায় মশগুল। কেউ তার অর্ডার শুনছে না।
কী মজা, কী মজা! এমন আনন্দের দিন কেন-আসে না রোজ...
বুদ্ধুর দল! সার্জেন্ট বরখ্‌ এ সব শুনলে রেগে আগুন হবেন। ওঠো, এক্ষুণি আমার সঙ্গে এসো!
সার্জেন্টকে এক্ষুণি খুঁজে বের করতে হবে। ফরাসি শয়তানগুলো তাঁকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে।
তাদের বেশিদূর যেতে হলো না। তারা বরখ্‌কে টলতে টলতে আসতে দেখলো।
এ কী! আপনার কি হয়েছে সার্জেন্ট?
চোখ মেলতেই আমি দেখলাম খোঁয়াড়ে শুয়োরদের মধ্যে আমি শুয়ে...
কী... কী বললেন?
[চলবে]

সপ্তর্ষি সরোবরের ওধারে

অনির্বাণ সেনগুপ্ত

রবিবার সকালে বাজার সেরে ফেরার পথে ডঃ দাসের বাড়িতে তাঁর পড়ার ঘরে ঢুকে দেখি টেবিলের ওপর একটা বিরাট ম্যাপ বিছিয়ে রেখে ঝুঁকে পড়ে ভদ্রলোক কি যেন দেখছেন। আমার পায়ের শব্দে মাথা তুলে তাকালেন, তারপর একগাল হেসে বললেন, 'টানা দুদিন হিমালয়ে ট্রেকিং করতে পারবে তো?'

আমায় কোনো কথা বলার অবকাশ না দিয়েই বলে যেতে লাগলেন, 'নিশ্চয় পারবে। তোমাদের এই বয়সে না পারার কি আছে? আরে, আমিই যদি এই পঞ্চাশ বছর বয়সে ট্রেকিং-এর ঝুঁকি নিতে পারি, তবে তুমি কেন পারবে না?'

উনি থামতে না থামতে এবার আমি বলে উঠলাম, 'একটু খুলে বলবেন তো! এই তো সবে কেদার বদ্রী ঘুরে ফিরলেন। এখনি আবার কোথায় যেতে চান?'

'কেন, জায়গার অভাব আছে নাকি। জানো, হিমালয়ের অনেক জায়গায় এখনো মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি।'

'হ্যাঁ, সে জানি। কিন্তু বিশেষ করে কোন জায়গাটায় যাওয়ার কথা ভাবছেন আপনি?'

'এই দেখো তবে।' বলে ম্যাপটার দিকে দেখালেন উনি। কাছে গিয়ে দেখলাম, হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলের একটা বিশদ ম্যাপ। তার মধ্যে লাল কালি দিয়ে দাগ দেওয়া আছে বদ্রীনাথে। বদ্রীনাথ থেকে কিছুটা ওপরে একটা বিন্দুকে ইঙ্গিত করে ডঃ দাস বললেন, 'এইটা হচ্ছে মানা গ্রাম। চীন সীমান্তের দিকে যেতে তথাকথিত শেষ গ্রাম। আর এই যে ত্রিকোণ দেখছ, এটা একটা ত্রিকোণাকৃতি হ্রদ। নাম সপ্তর্ষি সরোবর। মানা গ্রাম থেকে পুরো দুদিনের হাঁটাপথ। রাস্তা খুবই দুর্গম। তাও কিছু কিছু ট্রেকার ওখানে যায়। কিন্তু সপ্তর্ষি সরোবরের ওধারে কি আছে, কেউ জানে না। কারণ আজ পর্যন্ত কোনো অভিযাত্রী ওখানে যায়নি, বা গেলেও ফেরেনি। যতদূর জানি, মিলিটারী থেকেও কোনো টিম পাঠানো হয়নি।

একটা সূত্রে আমি খবর পেলাম, মানা গ্রামই ঐ অঞ্চলের শেষ গ্রাম নয়। সপ্তর্ষি সরোবরের ওপারেও একটা গ্রাম আছে। তবে খুবই ছোট্ট গ্রাম, মাত্র দশ বারো ঘর লোকের বাস। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ নেই, যোগাযোগ রাখার দরকারও নেই। সেই গ্রামটিতে একবার যাবার ইচ্ছে আমার।'

'হিমালয়ে ওরকম নাম-না-জানা গ্রাম অনেক আছে। হঠাৎ এটা নিয়ে আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?'

'কেন ঘামাচ্ছি? তবে শোন। কেদারনাথ যাবার পথে একজনের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। তার নাম সুন্দরলাল। স্থানীয় মানুষ, গাইড হিসাবে কাজ করে। একাধিকবার ট্রেকিং টিম নিয়ে সে সপ্তর্ষি সরোবরে গেছে। কিন্তু সেখানেই সে থেমে থাকেনি অদ্ভুত সাহসী লোক। একবার সম্পূর্ণ একা সে সপ্তর্ষি সরোবর ছাড়িয়ে গেছিল। আর আবিষ্কার করেছিল ঐ গ্রাম। আমার সঙ্গে মোটামুটি অন্তরঙ্গতা হতেই সে আমাকে এসব কথা বলে দেয়।

মজার ব্যাপার, গ্রামের লোকগুলো ওর কথা একেবারেই কিছু বোঝেনি। আর ও-ও বুঝতে পারেনি তাদের কথা। তারা নাকি সম্পূর্ণ অচেনা এক ভাষায় কথা বলছিল। সুন্দরলাল সে ভাষা কোনোদিন কোথাও শোনেনি। ও শুধু নিজের নামটা আর মানা গ্রামের নামটা ওদের বোঝাতে পেরেছিল। বলতে ভুলে গেছি, সুন্দরলালের বাড়ি মানা গ্রামেই। আর ওই লোকগুলোর গ্রামের নামটা কেবল ও উদ্ধার করতে পেরেছিল। গ্রামের নাম হরজপা তবে মানুষগুলো নাকি বেশ ভদ্র আর অতিথিপরায়ণ। অন্তত: সুন্দরলালের বক্তব্য তাই।

বুঝলে শশাঙ্ক, ঐ অচেনা অবোধ্য ভাষার কথাটা শোনা অবধি কৌতূহল আমায় কুরে কুরে খাচ্ছে। ওখানকার পাহাড়ীদের ভাষা মোটামুটিভাবে একইরকম। এমনকি তিব্বতী ভাষাও ওরা কিছু

কিছু বুঝতে পারে। তাই ভাবছি এরা কারা, যারা হিমালয়ের দুর্গম কন্দরে বাসা বেঁধে আছে!'

একটানা এতক্ষণ কথা বলে একটু দম নেওয়ার জন্য উনি থামতেই আমি প্রশ্ন করলাম, 'কবে রওনা হতে চান?'

'পুজোর ছুটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে। এর মধ্যে অনেক কাজ আছে। প্রথমে খরচটা হিসাব করে টাকার যোগাড় করতে হবে। খরচ হবে প্রচুর। সুন্দরলালকে চিঠি দিতে হবে। ও বলেছিল, ওকে জানালে ট্রেকিং-এর জন্য তাঁবু ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম যোগাড় করার ব্যবস্থা ও করবে। তবে তারও আগে মিলিটারী থেকে একটা লিখিত অনুমতিপত্র পেতে হবে ঐ অঞ্চলে ট্রেকিং করতে যাওয়ার জন্য। সেটা পেতে আমার বিশেষ অসুবিধা হবে না, কারণ ওখানে আমার পরিচিত কয়েকজন আছেন। আর সবচেয়ে বড় কথা, ট্রেনের রিজার্ভেশনটা পেতে হবে।' সবশেষে হেসে যোগ করলেন, 'দেখো হয়তো এমন কোনো স্টোরি পেয়ে গেলে, যা কাগজওলারা বেশ আগ্রহ করে ছাপবে।'

ঠিক দুমাস পরে পঞ্চমীর দিন রাতে হাওড়া থেকে দুন এক্সপ্রেস ধরে সপ্তমীর ভোরে আমরা দুজনে হরিদ্বারে নামলাম। হরিদ্বার থেকে বাসে হৃষীকেশ। হৃষীকেশে সারাদিন কাটিয়ে পরের দিন সকালে আমরা বদ্রীনাথের বাসে উঠলাম।

যাত্রাপথের বর্ণনা আর দেব না। তোমরা যারা ওপথে গেছ, তাদের তো আর নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। আর যারা যাওনি, হিমালয়ের সেই অপরূপ সৌন্দর্যকে চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলার মতো কলমের জোর আমার নেই।

বদ্রীনাথের বাসস্ট্যান্ডেই সুন্দরলাল আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। বয়েস আন্দাজ পঁয়ত্রিশ। হাসিখুশি মানুষটি, দেখলেই ভালো লাগে। দৃঢ় কর্মঠ চেহারা। ডঃ দাস তো তাকে দেখে খুশি হয়ে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর সে জানাল, আমরা একটু খাওয়াদাওয়া সেরেই নাকি মানা গ্রামের দিকে রওনা হব। ওর বাড়িতেই ট্রেকিং-এর জিনিসপত্র সব মজুত করে রেখেছে। রাতটা আমরা ওর বাড়িতেই অতিথি হবো। বদ্রী থেকে মানা অবধি যাওয়ার জন্য ও ঘোড়ার ব্যবস্থাও করে রেখেছে।

সেই ঘোড়ায় চড়েই আমরা মানা গ্রামে পৌঁছালাম। সুন্দরলালের বাড়িতে রাতটা বেশ ভালোই কাটল। পরের দিন আলো ফুটতে না ফুটতেই তৈরি হলাম আমরা। পায়ে ট্রেকিং-এর উপযোগী জুতো, হাতে লাঠি, পিঠে হ্যাভারস্যাক। কুলি পাওয়া যায়নি, কারণ একদম অচেনা পথে যেতে কেউই রাজী হয়নি। মালপত্র তাই আমাদেরই নিতে হয়েছে।

প্রত্যেকের মনেই একদিকে কৌতূহল, অপরদিকে উৎকণ্ঠা। আমাদের অনুমতিপত্র দেখিয়ে মানা গ্রামের মিলিটারী চেকপোস্ট পার হতে হলো। তার আগে অবশ্য আমাদের মালপত্র ভালভাবে তল্লাশী করা হলো। জানতাম ক্যামেরা নিয়ে ঐ অঞ্চলে যেতে দেবে না, হলোও ঠিক তাই। ওঁদের কাছে আমার ক্যামেরা জমা রেখে যেতে হলো। ডঃ দাস অবশ্য টেপরেকর্ডারটা সঙ্গে নিতে পারলেন, তবে শর্ত রইল ফেরার সময়ে টেপগুলো বাজিয়ে ওঁদের শোনাতে হবে।

এত কাণ্ডের পরে, অবশেষে আমরা আমাদের আসল গন্তব্যের পথে পা বাড়ালাম। পাহাড়ী রাস্তা ক্রমেই উঁচু হতে লাগল। পিছনে ফেলে আসা মানা গ্রাম ক্রমেই ছোট হতে হতে, একটা বাঁক ঘোরার পর একেবারেই চোখের আড়ালে চলে গেল। সভ্যজগতের শেষ সীমা ছাড়িয়ে এখন আমরা অজানা ভবিতব্যের পথে।

রাস্তা যে খুবই দুর্গম, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কখনো মানুষপ্রমাণ খাড়া চড়াই, আবার কখনো বা সেরকম উতরাই। মাঝে মাঝে রাস্তা বলতে কেবল এবড়োখেবড়ো পাথর। তার মাঝে মাঝে বরফ জমে আছে। দুপুরের দিকে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে একটা অভিজ্ঞতা হলো। পথ সেখানে এক হাতের বেশি চওড়া নয়। তার একদিকে পাহাড়ের দেওয়াল আরেকদিকে গভীর খাদ। পাহাড়ের দেওয়াল ধরে অতি সাবধানে একপা একপা করে নিচের দিকে না তাকিয়ে এগোতে হয়। তাকালেই তো মাথা ঘুরবে। জানি, চোখের সামনে অজস্র সৌন্দর্যের সম্ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বরফে ঢাকা শৃঙ্গগুলো, কিন্তু সেদিকে তাকানোর মতো অবস্থা ছিল না। অবশেষে এ পথ ফুরলো। বেশ বড় একটা পাথরের চাতালে এসে উঠলাম আমরা। সেখানেই তাঁবু খাটিয়ে রাতটা কাটল।

পরের দিন ভোরে আবার শুরু হলো চলা। সেদিন যা অভিজ্ঞতা হলো তা জীবনে কখনো ভুলব না। একটা সরু বরফজমা পথ, তার কোনোপাশেই পাহাড় নেই, দুদিকে খাদ। বুকে হেঁটে সে পথ পেরোতে হলো। বুকে ভর দিয়ে খানিকটা এগোচ্ছি আর চোখ বুজে খানিকক্ষণ করে বিশ্রাম নিচ্ছি।

বিকেল তিনটের সময়ে দেখা গেল সেই বহু-প্রতীক্ষিত সপ্তর্ষি সরোবর। ত্রিকোণ হ্রদ, চারপাশে বরফজমা থাকলেও এর জল যে কোনো কারণেই হোক, পুরো বরফ হয়নি। জলের ওপরে একটা সাদা পাতলা আস্তরণ পড়েছে শুধু। বিকেলের সূর্যের লাল আভা এসে পড়েছে দূরের একটা বরফ-ঢাকা চুড়োর ওপর, আর তার ছায়া এসে পড়েছে জলে—সে এক মায়াময় সৌন্দর্য।

সপ্তর্ষি সরোবরের তীরে, তারায় ভরা আকাশের নিচে তাঁবু খাটিয়ে সে রাতটা কাটালাম আমরা। ভোর হতেই শুরু হলো নতুন উৎসাহে হাঁটা। মজার ব্যাপার, সপ্তর্ষি ছাড়িয়ে আসার পর রাস্তা আর খুব একটা দুর্গম নয়। একসময় দেখি, পথটা গিয়ে শেষ হয়েছে একটা ফাটলের মধ্যে। সুন্দরলাল বললে, 'জী, এটাই শেষ বাধা। এটা পেরোতে পারলেই হরজপা গ্রাম।'

আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন।

ফাটলটা অতি সঙ্কীর্ণ। হামাগুড়ি দিয়ে পার হতে হলো। প্রথমে আমি, তারপরে ডঃ দাস, সবশেষে সুন্দরলাল। ফাটলের ওপাশে বেরিয়েই দেখি, সকালের সোনালী রোদে বরফে ঢাকা ঘাসের ওপর একটা বড়সড় চমরী গাই আর তার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা মানুষ।

প্রথমে আমি একটু চমকেই উঠেছিলাম। কারণ এই দুদিনে আমরা তিনজন ছাড়াও যে পৃথিবীতে মানুষ আছে, এই সত্যটাই যেন ভুলতে বসেছিলাম। আর সেও আমার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল। আমার পরেই এলেন ডঃ দাস। তাঁকে দেখে লোকটির বিস্ময় আরও বাড়ল। কিন্তু তৃতীয়জনকে দেখে তার চোখেমুখে বিস্ময়ের বদলে ফুটে উঠল খুশির ঝিলিক। বুঝলাম, সুন্দরলালকে সে চিনতে পেরেছে। একটা উল্লাসের চিৎকার ছেড়ে সে সোজা একদিকে ছুটে চলে গেল। তার যাওয়ার পথের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল, অল্প দূরেই পাহাড়ের ঢালে ছোট ছোট কয়েকখানা পাথরের কুঁড়ে। গোনাগুনতি বারোটা। কুঁড়েগুলোর মধ্যে একটা অন্যগুলোর তুলনায় একটু বড়। লোকটা গিয়ে সেটাতে ঢুকল, তারপর আরেকজনের সঙ্গে বেরিয়ে এসে আমাদের দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

অপর ব্যক্তিটি ধীরে ধীরে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। তাঁর বয়স হয়েছে যথেষ্ট, মাথার সাদা চুলে আর মুখের কোঁচকানো চামড়াতেই তার প্রমাণ। সুন্দরলাল ফিসফিস করে বলল, 'ইনিই হরজপা গাঁয়ের প্রধান।'

প্রধান আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মুখে সৌম্য হাসি। তারপর সুন্দরলালের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সুন্দরলাল।' বলা মাত্রই ডঃ দাস একটা কাজ করলেন। নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে, নিজের নাম অভিজিৎ' তিনবার বললেন। প্রধান একটু কষ্ট করে শব্দটা উচ্চারণ করলেন। আমিও তখন নিজের নাম তিনবার বললাম। প্রধান আমার নামটিও উচ্চারণ করলেন।

ডঃ দাস ইতিমধ্যে কাঁধ থেকে ব্যাগ নামিয়ে, টেপরেকর্ডারটা বার করে চালিয়ে দিয়েছেন। তারপর প্রধানের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করলেন নাম বলার জন্য। সে ইঙ্গিত তিনি বুঝলেন। নিজের দিকে দেখিয়ে বেশ গর্বিতভাবে বললেন 'লোরু লোরু।' তারপরে চোখ বুজে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করলেন, 'এরুপতি।'

ডঃ দাস এবার গ্রামের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'হরজপা?' লোরু হাসিমুখে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'হরজপা, হরজপা।' বুঝলাম, আমরা যে এই গ্রামের নাম জানি, তাতে উনি বিলক্ষণ খুশি হয়েছেন।

ততক্ষণে প্রথমজন গ্রামের অন্যান্য বাসিন্দাদেরও ডেকে এনেছে। সকলেরই পরনে পশুলোমের পোশাক। নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সব মিলিয়ে জনা পঞ্চাশেক হবে লোকসংখ্যা। সকলেরই চোখেমুখে বেশ বিস্ময় আর কৌতূহল। লোরু তাদের দিকে ফিরে কিছু বললেন, তাতে বাকী সবাই মাথা নেড়ে বেশ আগ্রহের সঙ্গে সায় দিল। লোরু এবার আমাদের উদ্দেশে কয়েকটা কথা বললেন, যার বিন্দুবিসর্গ, বলা বাহুল্য আমরা কিছু বুঝলাম না। ডঃ দাসের টেপরেকর্ডার অবশ্য চালু করাই আছে। আশা করি, কলকাতায় ফিরে কোনো ভাষাবিদকে দিয়ে বিশ্লেষণ করালে এ ভাষার স্বরূপ ধরা পড়বে। লোরু আমাদের অসহায় অবস্থাটা বুঝতে পারলেন। এবার তিনি হাতের ইশারায় আমাদের ওঁর সঙ্গে আসতে বললেন।

লোরুর পিছন পিছন আমরা গ্রামে এসে ঢুকলাম। সঙ্গে গ্রামের

অন্যান্যরা। সেই বড় কুঁড়েঘরটির চাতালে বসানো হলো আমাদের। একটু বাদেই কয়েকজন হাতে করে গোটাচারেক পাত্র এনে আমাদের সামনে রাখল। পাথরের পাত্র। তার তিনটেতে দুধ, আর একটাতে ফল। চেরি, পীচ, খোবানি প্রভৃতি। লোরু আমাদের ইঙ্গিতে বোঝালেন, খাও।

ডঃ দাস এবার একটা মজার কাণ্ড করলেন। ঝোলা থেকে শুকনো মাংসের একটা টিন বার করে কেটে লোরুর সামনে বাড়িয়ে ধরলেন তিনি। লোরু বুঝলেন, ডঃ দাসের বক্তব্য। একটু ইতস্ততঃ করে খানিক মাংস ভেঙে মুখে পুরলেন তিনি। মুখ দেখে মনে হলো, বেশ ভালোই লাগছে। আমি আর সুন্দরলাল এদিকে দুধে চুমুক দিয়েছি। বটের আঠার মতো ঘন, মিষ্টি গরম দুধ। লোরু ওদিকে আরেকটা পাথরের পাত্রে পুরো মাংসটা ঢেলে অন্যদের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। এক টিন মাংস অতজনকে ভাগ করে দিলে প্রত্যেকের ভাগে আর কতটুকু বা পড়ে। আরেকটু দিতে পারলে ভালো লাগত। কিন্তু আমাদেরও তো খাবার সীমিত, আবার সেই দুদিনের রাস্তা ভেঙে ফিরতে হবে।

সুন্দরলাল যে বলেছিল, এরা অতিথিপরায়ণ তা মিথ্যে নয়। খাওয়ার পর লোরু আমাদের বাড়িটা দেখালেন। বাড়িতে দুটো থাকার ঘর, রান্নার জায়গা আর একটা বেশ বড় ঘর, তাতে গমের দানা আর গম পেষার জন্য একটা পাথরের জাঁতা। পরিচয় হলো লোরুর স্ত্রী মিগুল আর ছেলে উরনের সঙ্গে। সবাই বেশ হাসিখুশি, এখানে কোনো অভাব আছে বলে মনে হয় না।

লোরুর সঙ্গে এরপর আমরা বেরোলাম গ্রাম দেখতে। বাড়িগুলো সমান দূরত্বে বেশ সুন্দরভাবে রয়েছে। গ্রামের প্রান্তে এসে লোরু আঙুল দিয়ে একটা জায়গা দেখালেন, সেখানে চাষের চিহ্ন। বুঝলাম, এখানেই গম চাষ হয়। একটু দূরেই পাহাড়ের গা দিয়ে অনেকগুলো ছাগল চরছে, আর একজন রয়েছে তাদের পাহারায়। বুঝলাম, দুধ আর লোমের যোগান এদের কোথা থেকে আসে।

আমার খুব তেষ্টা পেয়েছিল। লোরুকে সেকথা ইশারায় বোঝাতেই তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমাদের সঙ্গে করে আরেকদিকে নিয়ে এলেন। সেখানে পাথরের গা বেয়ে ঝরে পড়ছে ছোট একটা ঝর্ণা। সে জল অবশ্য এমন কনকনে ঠাণ্ডা যে, মুখে দিলে মনে হয় মুখের ভেতরটা বুঝি জমে গেল। তাই খেতে হলো বাধ্য হয়ে।

ডঃ দাস আর আমার ইচ্ছে ছিল, দুপুরবেলা হরজপা থেকে বেরিয়ে বিকেলের মধ্যে সপ্তর্ষি সরোবরের ধারে পৌঁছে যেতে। এটা ঠিকই, আর কয়েকদিন থাকলে এদের ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা যেত, কিন্তু আমাদের হাতে সময় কম। তা, মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। লোরুর বাড়িতে ফিরে এসে আমরা যখন আমাদের ঝোলাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছিলাম তখন লোরু, তার পরিবার আর গ্রামের অন্য সকলে আমাদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। ওদের বোঝানোর জন্য যে পথ দিয়ে আমরা এখানে এসেছি, সেই পথটাই হাত তুলে দেখালাম। সঙ্গে সঙ্গে লোরু ব্যাকুলভাবে ছুটে এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। সকলেই মাথা নাড়তে লাগল অর্থাৎ যেতে দেব না। আমরা ইঙ্গিতের সাহায্যে যতটুকু বোঝানো সম্ভব, বুঝিয়েও কোনো লাভ হলো না। এরা আমাদের ছাড়ল না কিছুতেই। তারপরে দেখি, আবার আমাদের জন্য পাথরের পাত্রে করে খাবার এনেছে। এবার হাতেগড়া রুটি আর দুধ। পেটভরে খেয়ে উঠতেই লোরু ঘরে নিয়ে এসে দেখালেন আমাদের জন্য নরম পশুলোমের বিছানা পাতা হয়েছে। সুন্দরলাল তো শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাক ডাকাতে লাগল। আমারও ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল, কিন্তু ডঃ দাস দেখি ঝোলা থেকে একটা ডায়েরি আর পেন বার করে কিসব লিখছেন। আমি প্রশ্ন করলাম, 'কি লিখছেন?'

'কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নোট করছি।'

'যেমন?'

'একটু দাঁড়াও।' খানিকক্ষণ লিখে ডায়েরি বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'প্রথমে এদের ভাষার কথাই ধর না কেন? একটা সম্পূর্ণ অন্যরকম ভাষা কি করে এই পাহাড়ঘেরা জায়গাটুকুর মধ্যে গজিয়ে উঠল! তারপর এদের বাড়িগুলো কিরকম সমান দূরত্বে পরপর রয়েছে। এরকম জ্যামিতিক সামঞ্জস্য কোনো গ্রামে সাধারণত দেখা যায় না। আর আমাকে সবচেয়ে যেটা অবাক করেছে, পাহাড়ী বাড়িগুলোতে সাধারণত একটাই ঘর থাকে, কিন্তু লোরুর বাড়িতে একাধিক ঘর। আরেকটা জিনিস তুমি বোধ হয় খেয়াল করনি। এদের কেউই কানে দুল পরে না, কিন্তু নারীপুরুষ প্রত্যেকেরই কান ফুটো করা।'

'আমার বিশ্বাস, এরা এখানকার আদি বাসিন্দা নয়। অন্য কোথাও থেকে এখানে এসে এরা আস্তানা পেতেছে। কথা হচ্ছে, কোথা থেকে?'

ডঃ দাস আরো কি কি যেন বলছিলেন, কিন্তু আমার কানে আর একটা কথাও ঢুকছিল না। আমি অকাতরে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম যখন ভাঙল, ঘড়িতে তখন বিকেল পাঁচটা। বরফের উপর তখন অস্তগামী সূর্যের আলোয় সোনার রঙ ধরেছে।

সেদিনের সন্ধ্যেটা মন থেকে সহজে মোছার নয়। চাঁদের আলো এসে পড়েছে চারধারের বরফঢাকা চুড়োগুলোর উপর। মনে হচ্ছে কেউ যেন গলানো রুপো ঢেলে দিয়েছে। আর সেই জ্যোৎস্নায় হরজপা গ্রামের সরল সুখী মানুষেরা নাচগান করছে। সে গানের কথা, সুর সবই আমার অপরিচিত, তবু ভালো লাগল শুনতে। ডঃ দাস টেপরেকর্ডারে এই গানকে ধরে রাখছিলেন।

নাচগানের মজলিস একসময় শেষ হলো। এরপর নৈশভোজের পালা। দেখলাম, শুধু আমাদের আর লোরুর পরিবারের জন্য পাথরের পাত্রে খাওয়ার ব্যবস্থা, বাকী সবার জন্য গাছের পাতা।

সারাদিন নিরামিষ খেয়ে কাটলেও এখন আমিষের ব্যবস্থা, আগুনে ঝলসানো পাহাড়ী ছাগলের মাংস। কিন্তু খাওয়া শুরু করার ঠিক আগে লোরু উঠে দাঁড়িয়ে একদিকে চললেন। দেখি সোজা গিয়ে তিনি পাহাড়ের গায়ে একটা গুহার মধ্যে ঢুকলেন। এই গুহামুখটা আগে খেয়াল করিনি। মিনিট পাঁচেক বাদে লোরু ফিরে এসে কিছু একটা বললেন, সঙ্গে সঙ্গে সকলে খাওয়া শুরু করল। আমরাও খেতে শুরু করে দিলাম। ডঃ দাস খেতে খেতে একবার গুহাটার দিকে আঙুল দেখিয়ে ইশারায় লোরুর কাছে জানতে চাইলেন 'ওখানে কী?' কিন্তু লোরুর মুখের ভাবে মনে হলো, তিনি বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই ডঃ দাস আর ঐ প্রসঙ্গে গেলেন না।

খাওয়াদাওয়া শেষ হলে দুপুরে যে ঘরে আমরা শুয়েছিলাম, সেখানেই আবার শুয়ে পড়লাম। এই নিভৃত শান্ত সৌন্দর্যের কোলে বসে, আমার কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, কি হবে আর কলকাতায় ফিরে? এখানে থেকে গেলেই তো বেশ হয়। ভাবতে ভাবতে ঘুম এসে গেল।

ঘুম ভাঙল কাঁধের ওপর কার হাতের চাপে। দেখি ডঃ দাস আমাকে ডাকছেন। ফিসফিস করে বললেন, 'ওঠ শশাঙ্ক। আমাদের একটু বেরোতে হবে।'

'কোথায়?' বিস্মিত আমি একটু উঁচু গলাতেই জিজ্ঞেস করি।

'আরে, চেঁচিও না। সুন্দরলাল জেগে যাবে। এস, বেরিয়ে বলব।'

অগত্যা উঠতেই হলো। ধড়াচুড়ো পরেই শুয়েছিলাম, জুতোটা পরে নিলাম। তারপর দুজনে বাইরে বেরোলাম।

চারিদিক সম্পূর্ণ নিঃশব্দ, অসম্ভব কনকনে ঠাণ্ডা, সে এক অপার্থিব অলৌকিক পরিবেশ। একটা অদ্ভুত শিরশিরে ভাব আমার মনকে ছেয়ে ফেলছিল। মনে হচ্ছিল আমরা যেন পৃথিবী থেকে বহু দূরে কোনো এক জনমানবহীন গ্রহে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি।

ডঃ দাস হনহন করে হেঁটে চলেছেন হাতে বড় একটা টর্চ নিয়ে। টর্চ কি কাজে লাগবে বুঝতে পারছি না। শুক্লপক্ষের রাত, চাঁদের আলোয় পৃথিবী স্নান করছে। আমি প্রশ্ন করার আগেই দেখি ডঃ দাস সেই গুহার মুখটায় এসে থেমেছেন, যে গুহায় লোরু ঢুকেছিলেন।

আমি বললাম, 'আপনি কি শেষপর্যন্ত এখানেই ঢুকতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ', সংক্ষিপ্ত জবাব। বলতে বলতে টর্চ জ্বেলে ঢুকে পড়লেন গুহার ভেতর। আমকেও যেতে হলো সঙ্গে। আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম, 'কেন ঢুকলেন? তখন দেখলেন তো এই গুহার দিকে আঙুল দেখানোয় লোরু কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন।'

'সেইজন্যেই তো আরো ঢুকছি। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এটা ওদের মন্দির। এদের অনেক কিছুই তো দেখলাম, পুজোআর্চার ব্যাপারটা একটু জেনে যাই।'

গুহার ভেতরটা খুব সরু, পাশাপাশি দুজন যাওয়া যায় না। চলতে চলতেই কথা হচ্ছিল আমাদের। একটু পরেই সরু পথটা শেষ হয়ে আমরা একটা বেশ বড় ঘরের মতো জায়গায় এসে পড়লাম। তার এককোণায় বড় পাথরের ওপর একটা লালচে রঙের ফলক। আকারে খুব বড় নয়, হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা যায়। তার সামনে কয়েকটা ফল, কিছু শুকিয়ে যাওয়া ফুল পড়ে আছে।

ডঃ দাস সোৎসাহে বললেন, 'ঠিকই ধরেছি। এটা ওদের মন্দিরই বটে। আর ইনিই হচ্ছেন উপাস্য দেবতা।' বলে পাথরটার কাছে গিয়ে ফলকের উপর টর্চের আলো ফেলে নিবিষ্ট মনে পরীক্ষা করতে লাগলেন। ক্রমশ ওঁর মুখের ভাব কিরকম বদলে গেল। একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে চাপা গলায় বললেন, 'শশাঙ্ক, আমরা এমন একটা আবিষ্কারের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, যা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। এদিকে এস, ভালো করে দেখ।'

কাছে গিয়ে দেখলাম ফলকটাকে। পাথরের নয়, বরং পোড়ামাটির বলে মনে হলো। খুব খুঁটিয়ে দেখলাম, ফলকের ওপর কিছু ছবি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। মনে হচ্ছে, একজন ধ্যানে বসেছেন। তাঁর পায়ের কাছে কয়েকটা জন্তু। কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে। হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো একটা ছবি মাথার মধ্যে খেলে গেল। কিন্তু...কিন্তু...সে যে একেবারেই অসম্ভব! ডঃ দাস আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার মাথায় কিছু একটা ঘুরছে। কি বল তো?'

'ইয়ে... মানে স্কুলের ইতিহাস বইতে.....'

'ঠিক, ঠিক।' উত্তেজিত গলায় চেঁচিয়ে ওঠেন ডঃ দাস, 'তোমার অত আমতা আমতা করার কিছু নেই। ঠিকই বুঝেছ তুমি। তোমার সঙ্গে আমার তফাত এই যে, তুমি এর ছবিই শুধু দেখেছ, আর আমি বিভিন্ন মিউজিয়মে আসল জিনিসটাই দেখেছি। নিঃসন্দেহে এটা সিন্ধুসভ্যতার একটা সীলমোহর। শশাঙ্ক, আজ যাদের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি, আমার অনুমান—না, অনুমানই বা বলি কেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পাঁচ হাজার বছর আগের সিন্ধুসভ্যতার অধিবাসীদের উত্তরপুরুষ তারা।'

আমি শুধু হতবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

বেশ কিছুটা সময় কেটে গেছে। একটু ধাতস্থ হয়ে ডঃ দাস এবার অর্নগল বলতে শুরু করেছেন—

'দেখো শশাঙ্ক, সুদূর অতীতে এরা যে কোনো কারণেই হোক নিজেদের আদি বাসভূমি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। খুব সম্ভবতঃ বহিঃশত্রুর আক্রমণই এর জন্য দায়ী। ঘুরতে ঘুরতে বা শত্রুর হাত থেকে পালিয়ে বেড়াতে বেড়াতে তাদের একটা দল এসে পৌঁছল হিমালয়ের এই দুর্গম অঞ্চলে। বাইরের কারোর আসার

সম্ভাবনা এখানে নেই বললেই চলে। তাই নিশ্চিন্তে এখানে বসতি করল তারা। সঙ্গে ছিল দেবতার প্রতিকৃতি, গুহার মধ্যে স্থাপন করে গুহাকেই বানানো হলো মন্দির। সিন্ধুসভ্যতার বাসিন্দারা নরম মাটির ইঁট পুড়িয়ে তাই দিয়ে বাড়ি বানাত। এখানে সেরকম মাটি কোথায়? তাই শুরু হলো পাথরের ব্যবহার। এদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা সবাই কানে দুল পরত। এরা সেকথা ভুলে গেছে, কিন্তু কান ফুটো করার ঐতিহ্য চলে আসছে বংশপরম্পরায়। এদের গ্রামের নামটাই ধর। বোঝাই যাচ্ছে, আমরা যাকে হরপ্পা নামে চিনি, যার আসল উচ্চারণ সম্ভবত হরযূপীয়া, তার থেকেই এসেছে এই হরজপা। আমার যতদূর মনে পড়ছে, একজন ঐতিহাসিক প্রমাণ করেছেন, একরুপতি নামে সিন্ধুসভ্যতার এক দেবতা ছিলেন।'

আমি আর থাকতে না পেরে বললাম, 'তা এদের ভাষাও কি সেই হরপ্পারই ভাষা?'

'নিশ্চয় তাই। দেখো, ভাষার পরিবর্তন হয় বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মেলামেশায়। কিন্তু যা মনে হয় এরা বাইরের জগতের সঙ্গে মেশেনি। সুতরাং ভাষা একই থাকবে, এতে আর আশ্চর্যের কী আছে?

ডঃ দাসের কথা থেমে গেল একটা ক্রুদ্ধ গজরানিতে। চমকে তাকিয়ে দেখি, লোরু আর উরন। দুজনের চোখ আগুনের মতো জ্বলছে। মুখে বন্ধুত্বের লেশমাত্র চিহ্নও নেই, তার বদলে ফুটে উঠেছে তীব্র ক্রোধ। নিমেষের মধ্যে লোরু আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

আমি বাধা দেবার আগেই লোরু আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চললেন। টের পেলাম, বয়স্ক মানুষটার গায়ে অসুরের মতো শক্তি। দেখলাম, উরন ডঃ দাসের হাত ধরে টানছে। রাতের খাওয়াদাওয়া যেখানে হয়েছিল, সেখানেই নিয়ে আসা হলো আমাদের। সুন্দরলালকেও নিয়ে আসা হয়েছে। গ্রামের সকল বাসিন্দাই এসে আমাদের ঘিরে ধরেছে। হতাশ দৃষ্টিতে দেখলাম, প্রত্যেকের চোখে অসম্ভব রাগ। পালানো অসম্ভব, পালাতে গেলে জীবনের যেটুকু আশা আছে, তাও থাকবে না। ভিড় থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে লোরু আরেকজন বৃদ্ধের সঙ্গে কিছু পরামর্শ করছেন। সুন্দরলাল ফিসফিস করে আমাকে জিজ্ঞাসা করল,'কি করেছেন?' উত্তর দিতে হলো। সুন্দরলাল কাঁপা গলায় বলল, 'কেন একাজ করতে গেলেন? আর কি এরা আমাদের জীবন্ত ফিরতে দেবে।'

সুন্দরলালের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা ঘটল। পায়ের নিচে মাটি কেঁপে উঠল প্রবলভাবে। তার ধাক্কায় আমরা তিনজনই গড়িয়ে পড়ে গেলাম। হরজপার মানুষেরা তীব্র আর্তনাদ করে উঠল। তখনি ডঃ দাস, আমাকে আর সুন্দরলালকে টেনে দাঁড় করিয়ে বললেন, 'দৌড়ও।'

বাঁচার তাগিদে দৌড়ে চললাম আমরা। মাটি কাঁপছে সাংঘাতিকভাবে। আর পৃথিবীর গভীর থেকে উঠে আসছে কানে তালা-ধরানো একটা ভয়াবহ শব্দ। যেন একসঙ্গে কেউ হাজার হাজার ডুগডুগি বাজাচ্ছে। দুপাশ থেকে গড়িয়ে আসছে বড় বড় পাথরের চাঁই। আর তার সঙ্গে পেছনে ফেলে আসা হরজপার মানুষদের কাতর চিৎকার।

যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল, সেরকম হঠাৎ করেই থেমে গেল ভূমিকম্প। পিছনে তাকিয়ে দেখি, বিরাট ধস নেমে ঐ গ্রামকে পুরো চোখের আড়াল করে দিয়েছে। কে জানে, গ্রামটার অস্তিত্ব আর আছে কিনা। থাকলেও, এই বিশাল পাথরের স্তূপের বাধা পেরিয়ে সেখানে যাওয়া আর সম্ভব নয়।

যে সরু ফাটল দিয়ে আমরা এখানে এসে ঢুকেছিলাম, আশ্চর্য সেটা কিন্তু একইরকম আছে। ফাটলের এপাশে বেরিয়ে এসে আমরা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। যদিও সামনে তখনো অনেক পথ বাকী, তবু উপস্থিত তো প্রাণে বেঁচেছি।

তারপর দুদিন না খেয়ে, অপরিসীম কষ্ট করে কিভাবে মানা গ্রামের মিলিটারী চেকপোস্টে নেমে এসে তারপর মিলিটারীরই সাহায্যে সমতলে এলাম, সে কাহিনী আর বিস্তারিত বলার দরকার নেই। হিমালয়ের সেই ভয়াবহ ভূমিকম্পের কথা সবাই খবরের কাগজে জেনেছে, কিছুটা টেলিভিসনে দেখেছে। আমরা সেই ধ্বংসলীলার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। প্রকৃতির রুদ্ররূপের যে চিহ্ন আমরা ফেরার সময়ে দেখেছিলাম, তার বর্ণনা কারোরই ভালো লাগবে না।

তারপরে অনেকদিন কেটে গেছে। সুন্দরলাল বহাল তবিয়তে মানা গ্রামেই আছে। ডঃ দাসের সঙ্গে যোগাযোগ আছে চিঠিতে। সে এখনো গাইডের কাজ করছে, তবে সপ্তর্ষি সরোবরে সে আর যায়নি, যেতে চায়ও না।

আমি একদিন সাহস করে ডঃ দাসকে বলেছিলাম, 'ভালভাবে যোগাড়যন্ত্র করে, আরেকবার সেখানে গেলে হয় না? গ্রামটার অস্তিত্ব এখনো হয়তো আছে। আরেকবার গেলে হয়তো আরো অনেক ঐতিহাসিক তথ্য জানা যেত।'

ডঃ দাস অদ্ভুত হাসি হেসে বলেছিলেন, 'শশাঙ্ক, এ পৃথিবীর কত আশ্চর্য ঘটনাই তো মানুষের অগোচরে রয়ে যাচ্ছে। সবকিছু জানার দরকারই বা কী? আমার মনে হয়, ভূমিকম্পে পুরো গ্রামটা নিশ্চিহ্ন হয়নি। অন্তত কিছু লোক বেঁচে আছে। তাদের শান্তিতে থাকতে দাও।'

কর্মব্যস্ততার মধ্যে কেটে যায় দিনের পর দিন। কিন্তু যখনই একটু অবসর পাই, মনে পড়ে প্রকৃতির নিভৃত আলয়ে সেই গ্রামটির কথা। যার বাসিন্দারা, পাঁচ হাজার বছর পুরনো এক সভ্যতার উত্তরাধিকারী। কোনো-না-কোনো একদিন এই আশ্চর্য সত্য নিশ্চয়ই পৃথিবীর সবাই জানবে। জানবে কি? কি জানি!

ছবি: প্রণবকুমার হাজরা

অরণ্যপতি টারজান

সব্যসাচী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আরও কতক্ষণ এইভাবে ভাবতে হতো টারজানকে, কে তা বলবে? কিন্তু তার হঠাৎই ছেদ পড়ল সমস্ত চিন্তায়, উবে গেল তার অন্তরের সকল সংশয়, একটি মাত্র কারণে। সিংহটি চর্বণ বন্ধ করেছে, ঘাড়টা ঘুরিয়ে আগুন চোখে তাকিয়েছে মানুষটার দিকে। সে দৃষ্টির তাৎপর্য বুঝতে এক সেকেন্ডও দেরি হলো না ওর। ও ককিয়ে চেঁচিয়ে উঠল— "ভগবানের দোহাই! বাঁচান, বাঁচান আমাকে—"

ঐ আবেদনের সুর যে কতখানি আর্তিপ্রসূত, তা হৃদয়বান লোকই বুঝবে। তা হৃদয় যে টারজানের অতি প্রশস্ত এবং অতি উদার, তাতে তো কারও সংশয় থাকবার কথা নয়। সে হৃদয় মানুষের দুঃখে তো বিকল হয়ই, পশুর দয়াভিক্ষাকেও উপেক্ষা করে না।

কাজেই বিপন্ন লোকটার কাতর প্রার্থনা যে বিচলিত করবে টারজানকে তাতে আশ্চর্য কী আছে? সে দাঁড়িয়ে ছিল অশ্বদেহটার ডাইনে, হারানিধি মিচেলসকে নিরীক্ষণ করছে বাঁ দিকে মাথা ঘুরিয়ে। টারজান পিছন দিক দিয়ে ঘুরে গেল সেই বাঁ দিকেই। এমনভাবে দাঁড়াল হারানিধির সামনে, যাতে পশুরাজের আগুন দৃষ্টি থেকে মিচেলসকে আড়াল করা যায়।

পশুরাজ হলেও হারানিধি তো পশু ছাড়া আর কিছু নয়? পশুর মগজে কোনো একটা নতুন তথ্য ঢুকতে সময় লাগে। তার সমুখের মানুষটা যে বদলে গিয়েছে, এটা হঠাৎ তার বোধগম্য হলো না। সে যা বুঝল, তা হলো এই যে তার সামনের মানুষটা একটু আগেই ছিল মাটিতে শোয়া অবস্থায়, এখন হঠাৎ বিনা নোটিশে সে উঠে দাঁড়িয়েছে। আর, উঠে দাঁড়ানো শুধু নয়। সে সমানে সমানে দৃষ্টি বিনিময় করছে শ্রীল ন্যুমা মহারাজের সঙ্গে, এটাকে হারানিধি বিবেচনা করল চরম ধৃষ্টতা। তার ধারণা এইরকম যে, পশুরাজের সমুখে হাজির হতে হলে মানুষ পশু সবাইকেই এসে দাঁড়াতে হবে ভীতসন্ত্রস্তভাবে। এ লোকটা অন্যরকম করে কেন? এবং করে কোন স্পর্ধায়?

নিজের অসন্তোষটা প্রকাশ করবার জন্য হারানিধি এবার চাপা তর্জন বার করল গলা দিয়ে। তার অর্থ—"রাজার সমুখে কীভাবে দাঁড়াতে হয়, তাও জানো না বেকুফ?"

এর উত্তরে টারজান যা বলল সিংহভাষায়, তার মানবভাষার তর্জমা এমনিধারা দাঁড়ায়— "অন্যের কাছে তুমি রাজা নিশ্চয়ই।

কিন্তু তোমার আমার মধ্যে অন্য পরিচয় আছে না একটা? এই পরিচয় যে আমরা দু'জন পরস্পরের বন্ধু?"

মুখে চলছে এই তোষামোদের ফুলঝুরি, হাতেও ওদিকে অন্য কাজ করে চলেছে টারজান। ডানদিকে একটু হেলতেই সে মরা ঘোড়াটার শিরদাঁড়ার নাগাল পেয়ে গিয়েছে। সেই অবস্থাতেই সেই শিরদাঁড়া শক্ত করে ধরে এক হাতে ধড়টা উঁচু করে ধরেছে। আর ফিসফিস করে নির্দেশ দিয়েছে— "উঠে পড়, আমার ঠিক পিছনে দাঁড়াও।"

হারানিধি কিন্তু এসব কাণ্ডকারখানার কোনো খবরই রাখে না। টারজানের বন্ধুত্বের দাবিটা কোন ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, সে খতিয়ে দেখছে সেইটাই। চেষ্টা করে করে কতকগুলো সাম্প্রতিক ঘটনার কথা ঈষৎ ঈষৎ স্মরণে আনতে পারলও যেন। কোথায় একটা সুড়ঙ্গের ভিতর একটা সিংহ থাকত যেন, কে যেন তাকে বেঁধে রেখেছিল একটা গাছের গুঁড়িতে। সেই আবার তাকে বারার (হরিণের) মাংস খাওয়ালো পেট ভরে। বারার না গোমাঙ্গনির (মানুষের)? এই তো সবে কালই। এই যে সুয্যিটা উঠছে, ওটা যখন লুকিয়েছিল জঙ্গলে তখনই খাওয়ালো।

ঐ লোকটাই বোধ হয়। হ্যাঁ, ঐ লোকটাই নিশ্চয়ই। ন্যুমার সামনে দাঁড়িয়ে জোর গলায় কথা কইতে হারানিধি একটামাত্র মানুষকেই দেখেছে। সে ঐ মানুষটাই। বন্ধু? বন্ধুত্বের দাবি করছে ও? তা বন্ধুত্ব যদি করতেই হয়, এইরকম মানুষের সঙ্গেই করতে হবে। যে উপোসের সময় মাংস এনে দিতে পারে।

হারানিধির ভ্রূকুটি আস্তে আস্তে মিলিয়ে এল।

টারজান ওদিকে ফিসফিস করে বলছে, "হের মিচেলস, তুমি ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে আমার আড়ালে আড়ালে পিছু হটে চলে যাও ঐ ঝোপটার পেছনে। ওখানে গিয়ে চুপটি করে অপেক্ষা কর আমার জন্য। আমার সঙ্গে ছাড়া এক পা-ও হাঁটবার চেষ্টা করো না। কর যদি, সেটাই হবে তোমার জীবনের শেষ পা ফেলা।"

মিচেলস কথামতো কাজ করছে কিনা, ফিরে তাকিয়ে এক পলক দেখে নেবে, এমন সাহস নেই টারজানের। তা করতে গেলেই ন্যুমাও তাকাবে সেদিকে, ওরা এমনই সন্দেহপরায়ণ জীব।

না, ফিরে তাকানোর সাহস নেই, তবু টারজান বেশ বুঝতে পারছে, কথা তার অমান্য করেনি মিচেলস। কোন সাহসে করবে? তার জীবন তো টারজানের হাতে এখন।

আরও কিছুক্ষণ একই জায়গায় একইভাবে দাঁড়িয়ে টারজান খোশবৈঠকী গল্প চালিয়ে গেল হারানিধির সঙ্গে। তারপর হারানিধির

মিলিত হলো মিচেলস-এর সঙ্গে

দৃষ্টি আকর্ষণ করল ঘোড়াটার মাথাহীন ধড়টার দিকে— "ওটাকে ভোগে লাগিয়ে দাও বন্ধু! না খেয়ে যদি চলে যাও, ফিরে এসে দেখবে শুধু হাড়গুলো পড়ে আছে। আকাশে আমি স্কা (শকুন) দেখতে পেয়েছি গোটা কতক—"

"ঠিক বলছে বন্ধু।" গর্জে উঠল হারানিধি, "পাজি স্কাগুলোর জন্য রয়ে বসে কোনো কাজ করার যো নেই। ক্ষিধে থাক না থাক, এক্ষুণি খেয়ে নিতে হবে। রেখে গেলে তো ফাঁকি পড়ে গেলে। আমাদেরও হয়েছে এমন গেরো।"

হারানিধি তৎপর হয়ে অশ্বমাংস ভোজনে লেগে গেল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে তার আর ভাবনাচিন্তা নেই। সমুখের ছয় ফুট লম্বা মানুষটার অস্তিত্ব সম্পর্কেও সে আর সচেতন নয়।

টারজান পায়ে পায়ে পিছু হটতে লাগল। একান্ত নিঃশব্দে। পায়ে পায়ে গিয়ে মিলিত হলো মিচেলস-এর সঙ্গে ঝোপের আড়ালে।

হারানিধিকে অশ্বমাংস ভোজনে বসিয়ে দিয়ে মিচেলস-এর কাছে এসে জুটতে কম সময় লাগেনি টারজানের। সেই সময়টুকুর মধ্যে অনেক কিছু ভেবে নিয়েছে মিচেলস। ভেবে নিয়েছে এই জংলী মানুষটার সম্বন্ধে। দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড পুরুষ। আফ্রিকার কোনো কোনো অঞ্চলে এমন বিরাট কলেবরের মানুষ নাকি অনেক দেখা যায়। নিজে মিচেলস দেখেনি, শুনেছে গল্প। কিন্তু সেসব মানুষ হলো কৃষ্ণাঙ্গ। অথচ এই যে লোকটা, মিচেলসকে যে এইমাত্র নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করল, এর গায়ের রংটা বর্তমানে রোদে পোড়া তামাটে দেখাচ্ছে যদিও, তা যে মূলত সাদাই ছিল, তা সহজেই বোঝা যায়। তাহলে তো এটা সমস্যারই বিষয় হয়ে দাঁড়ালো একটা। আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ? অবশ্যই ইউরোপ থেকে এসেছে। কীভাবে এল? কবে এল? ইউরোপ থেকেই যদি এসে থাকবে, তাহলে ওর গায়ে কোনো বসন নেই কেন? ঘোরতর সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান করতে না পারলে তো বোঝাই যাচ্ছে না জীবনদাতা এই বনচরের সম্বন্ধে কী ধারণা তার করা উচিত।

একথা অবশ্য অনস্বীকার্য যে এই লোকটাই এইমাত্র জীবনরক্ষা করেছে তার। সেজন্য তার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা অনুভব করা উচিত মিচেলস-এর। কিন্তু এ ব্যাপারেও একটা ঘোরতর খটকা লাগছে।

খটকা অকারণে নয়। এই কয়েক দিন আগে কর্নেল আন্দ্রেকরের হেডকোয়ার্টারে সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে গিয়েছে একটা। সেখানে মিচেলস গিয়েছিল কর্নেলকে কিছু সামরিক তথ্য জানাতে। হঠাৎ খোলা জানালা দিয়ে এমনিধারাই একটা দৈত্যাকার পুরুষ লাফিয়ে ঢুকে পড়ল সেই ঘরে, আর কেউ কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই মেজর মুয়েরবার্নককে কাঁধের উপরে তুলে নিল। মেজর একটা চীৎকার করারও সময় পাননি। তাঁকে নিয়েই সে দৈত্য আর এক লাফে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মিলিয়ে গেল অন্ধকারে অরণ্যে, সেই থেকে মেজর মুয়েরবার্নকের কোনো সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছে না। খুব সম্ভব তাঁকে হত্যাই করেছে সেই দৈত্য।

যদি করে থাকে, কেন করল? কে সে? সে আর এই দৈত্যপুরুষ কি একই ব্যক্তি? এত তাড়াতাড়ি সেই দৈত্যটা আন্দ্রেকারের আফিসে ঢুকেছিল আর এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়েছিল যে তার গায়ের রং লক্ষ্য করার কোনো সুযোগই হয়নি মিচেলস-এর। সে কি এই লোক? সে কি এই লোক? হয় যদি, তা হলে মুয়েরবার্নকের হত্যাকারী এই ঘাতকের করে মিচেলস-এর জীবনই কি নিরাপদ?

কী করবে মিচেলস। কী করবে সে?

তখনও সে ভাবছে, টারজান এসে ফিসফিস করে বলল, "চল। আমার সঙ্গে ছাড়া এক পা চলার চেষ্টা করো না। করলেই মারা পড়বে। সিংহ, চিতা এ বনে অনেক।"

দু'জনে পাশাপাশি হাঁটছে। টারজান লক্ষ্য করল, মিচেলস-এর কোটের সমুখটি ছেঁড়া। তার ভিতরে একটা লকেট দেখা যাচ্ছে। টারজান চমকে উঠল সেটা দেখে। তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "লকেটটা তুমি কোথায় পেলে?"

"এটা? কাপ্তেন মুয়েরবার্নক রাখতে দিয়েছে..."

"কাপ্তেন? মেজর বল! যে লোক গ্রেস্টোক খামারে লুঠতরাজ চালিয়েছিল, তার কথা বলছ তো?"

"হ্যাঁ। হ্যাঁ। কাপ্তেন মুয়েরবার্নকই তো লুঠতরাজ চালিয়েছিল গ্রেস্টোক খামারে। তুমি তাকে মেজর বলে ভুল করছ। মেজর মুয়েরবার্নকও একজন ছিলেন, দুই ভাই ওঁরা, তা মেজর বোধহয় অপঘাতে মারা গেলেন সেদিন। আমার কাছে এই লকেট গচ্ছিত রেখেছে কাপ্তেন মুয়েরবার্নক। আমার বন্ধু হয়ে সে—"

টারজান রূঢ় স্বরে বলল, "সে যা-ই হোক, ও-লকেট আমার। আমায় দিয়ে যাও—"

"তো-মার?" একমুহূর্ত টারজানের মুখের দিকে অপলক চোখে তাকালো মিচেলস। সে সাহসই পেলো না টারজানের আদেশের প্রতিবাদ করতে। দিয়ে দিল নীরবে লকেটটা।

ওটা নিয়ে একটুখানি নাড়াচাড়া করছে টারজান, বেশ একটু অন্যমনস্কই। সে দাঁড়িয়েছে মিচেলস-এর দিকে পিছন ফিরে। মিচেলস হঠাৎ পকেট থেকে পিস্তল বার করে তাই দিয়ে টারজানের মাথার পিছন দিকে আঘাত করল, দেহের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে।

আঘাত বুঝি মস্তিষ্কেই লাগল। অজ্ঞান হয়ে টারজান লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। মিচেলস তার হাত থেকে লকেটটা নিয়ে এক দৌড়ে অরণ্যমধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

[চলবে]

ছবি: নারায়ণ দেবনাথ

ভবিষ্যতের ঠিকানা

পদ্মা চৌধুরী

ফায়ার ফাইটার হতে চাও ?

পশ্চিমবঙ্গের ফায়ার সার্ভিস ডাইরেক্টরেটে প্রতি বছর ফায়ার ফাইটার নিয়োগ হয় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ মারফত। যোগ্যতা থাকা চাই—

(১) অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ

(২) বয়স ১৮ থেকে ৩৫

(৩) বুকের ছাতি হবে ৩৪ ইঞ্চি (৮১ সেমি)
ফুলিয়ে—৩৬ ইঞ্চি (৮৬ সেমি)

উপরোক্ত মাপ জোপ ঠিক থাকলে ১০০ মিটার দৌড়তে হবে। এরপর পিঠে ওজন চাপিয়ে ১০০ মিটার দৌড়। তারপর ৪০ কিলো ওজন বইতে হবে এবং একটি ঝোলানো দড়ি বেয়ে ২৫ ফুট উঠতে হবে। তাছাড়াও আছে হাউস রেস্, হোস্ ক্যারিং ও অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট। যারা এই সব পরীক্ষায় পাশ করবে, তাদের দিতে হবে সাইকোলজিকাল টেস্ট। অর্থাৎ শারীরিক নমনীয়তা, উপস্থিত বুদ্ধি এবং আকস্মিক ঘটনাকে সামলানোর দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতার টেস্ট। এরপর দু'মাসের স্পেশাল ট্রেনিং। ট্রেনিং পিরিয়ডে আছে ২০০ টাকার স্টাইপেন্ড।

ট্রেনিং সমাপনান্তে 'ফাইটার' হিসাবে চাকরি পেলে প্রার্থীগণ ১০০০ থেকে ২,৫০০ টাকা মাসিক বেতন পাবে। প্রমোশনের ব্যবস্থাও আছে। ফায়ার ফাইটার হিসাবে প্রবেশ করে যোগ্যতা থাকলে ডিভিশনাল অফিসার, ডেপুটি ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর পর্যন্ত হওয়া যায়। প্রমোশনের চ্যানেলটি এই রকম—(১) ফায়ার ফাইটার, (২) লিডার, (৩) সাব-অফিসার, (৪) স্টেশন অফিসার, (৫) অ্যাসিঃ ডিভিশনাল অফিসার, (৬) ডিভিশনাল অফিসার, (৭) ডেপুটি ডিরেক্টর, (৮) ডিরেক্টর।

সাব-অফিসারের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক পাশ বা সমতুল। শারীরিক যোগ্যতা ফায়ার ফাইটারের তুলনায় একটু শক্ত। সাব-অফিসারদের প্রশিক্ষণকাল তিন মাস। সাব-অফিসারের মাসিক মাহিনা ১৬০০ টাকা থেকে ২৬০০ টাকা পর্যন্ত।

ফায়ার সার্ভিসের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় চারটি সংস্থায়—(১) ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশান, (২) ইন্টারন্যাশানাল এয়ারপোর্ট অথরিটি, (৩) ন্যাশানাল ফায়ার সার্ভিস, নাগপুর, (৪) পঃ বঙ্গ ফায়ার সার্ভিস, কলিকাতা।

তোমরা যারা পৃথকভাবে ফায়ার ফাইটার ট্রেনিং নিতে চাও তারা পত্রালাপ করো এই ঠিকানায়—Director, National Fire Service College, NAGPORE (Pin Code-440001)

সরকারি চাকরি ছাড়াও বহু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা বড় বড় কারখানা ফায়ার ফাইটার নিয়োগ করেন। যেমন গার্ডেনরিচ শিপিং কর্পোরেশন, রেলওয়েজ, পোর্ট ট্রাস্ট, ইন্টারন্যাশানাল এয়ারপোর্ট অথরিটি ইত্যাদি। কারণ, অগ্নি-নির্বাপক ব্যবস্থা সর্বত্রই রাখা হয়।

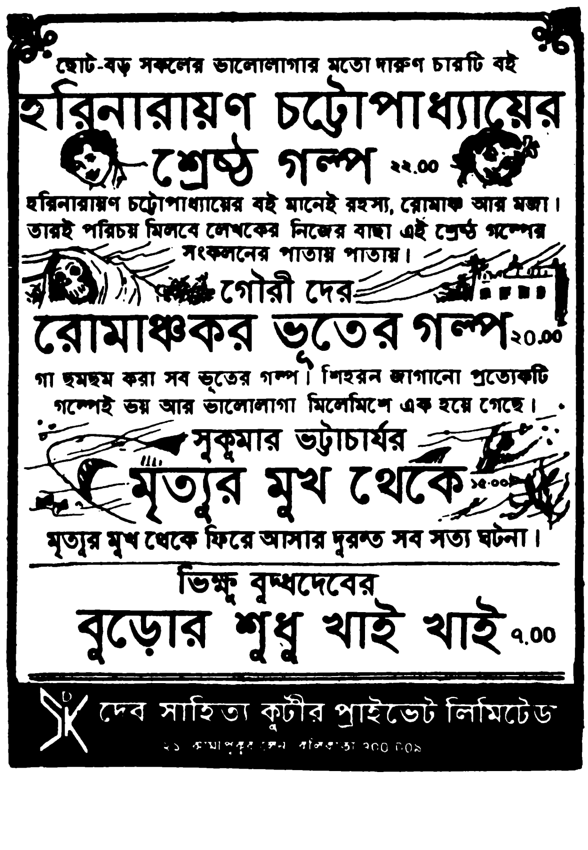

পিসি ও লুসি

দেবীপ্রসাদ রায়

পিসিমণি ঝোলাটা নামিয়ে রাখেন দোরগোড়ায়। দেওঘর গিয়েছিলেন গুরুদেবের দর্শন মানসে। তা দর্শন মিলেছে। গুরুদেবের আশীর্বাদী ফুল বিল্বপত্র সহায় করে ফিরেও এসেছেন বহাল তবিয়তে।

'ঘাউ।' হঠাৎ একটা কুকুর ডেকে ওঠে। পিসিমণি খরগোশের মতো কান খাড়া করে ব্যাপারটা কী বোঝার চেষ্টা করেন। হুম্,

মোটেই ভালো কথা নয়। ক'দিন বাড়ি ছিলেন না আর সেই সুযোগে বাড়ির লোকেরা একটা কুকুরকে ঘরে ঢুকিয়ে বসে আছে গা। ড্রইংরুমে ঢুকেই ভাই খোকা ব্যানার্জিকে হাতের কাছে পেয়ে যান পিসিমণি।

'খোকা, কুকুর পুষেছিস মনে হচ্ছে। বামুন বাড়িতে এ কি অনাসৃষ্টি কাণ্ড, বল দিকিনি।'

'এতে অনাসৃষ্টির কী দেখলে, দিদিভাই।' খোকা ব্যানার্জির মৃদু কণ্ঠস্বর, 'এবাড়িতে লোকেরা কুকুর পোষেনি নাকি এর আগে ?'

'বিলক্ষণ পুষেছে। কিন্তু এরকম ঘরের ছেলের মতো ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ানো কুকুর পোষার আদিখ্যেতা দেখিয়েছে কেউ কস্মিনকালে ?'

'ঘাউ !' হঠাৎ কানের কাছে কুকুরের ডাক। কুকুর বটে একখানা। দশাসই চেহারা। মুখখানা ঠিক জুতোর মতো লম্বাটে। গায়ে তেল চিক্কন কালো লোম।

'একেই তোর পছন্দ হলো, এই গণ্ডারমার্কা কুকুরটাকে ?'

'হেঃ হেঃ, এর নাম ডোবারম্যান। ভয়ানক হিংস্র।'

'দুত্তোর হিংস্র। ওকে কবে বিদেয় করছিস।'

'ঘাউ।' লুসি এতক্ষণ একমনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল পিসিমণিকে। পিসিমণির চিলের মতো তীক্ষ্ণ গলা, হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলার ধরন কোনোটাই পছন্দ হয়নি লুসির। রাগি রাগি গলায় সে ডাক ছাড়ে, 'ঘাউ ঘাউ।'

'আস্তে কথা বল দিদি, লুসি কিন্তু রেগে যাচ্ছে।'

'তোদের কুকুরকে মেনে চলতে হবে আমায়!' তিক্ত কণ্ঠে পিসিমণি লুসিকে ধমকে ওঠেন, 'নিকাল ইহাঁসে, বেকুফ কুত্তা।'

'ঘাউ, ঘাউ, ঘাউ,' যুদ্ধং দেহী মনোভাব নিয়ে লুসি দু'তিন কদম এগিয়ে আসে পিসিমণির দিকে। পিসিমণি গুটিয়ে যান। সেই সময় ভাইপো বাপি ঢোকে ঘরে। লুসিকে রাগ দেখিয়ে বলে, 'একি হচ্ছে লুসি! জানিস, ইনি আমাদের পিসিমণি।' লুসি এবার দুষ্টু দুষ্টু চোখে তাকায় পিসিমণির দিকে। 'পিসিমণিই এই বাড়ির অভিভাবক এই কথাটা মনে রাখিস।'

এই বাড়ির অভিভাবক আর কেউ নয় এই জীর্ণশীর্ণ মহিলাটি শুনেই যেন খুব একচোট হেসে নেয় লুসি। অন্তত তার হাবভাব দেখে তাই মনে হয় পিসিমণির। 'ভারি বেয়াদপ তো,' পিসিমণি তো চটে লাল মুখে ওর টিটকিরি মারা হাসি দেখে।

লুসি বললে, 'ধ্যুৎ।'

'এ্যাঁ!' পিসিমণি চোখ গোল গোল করে লুসির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর সখেদে বললেন, 'দেখলি বাপি, এই ফোচকে কুকুরটা আমায় বললে কিনা ধ্যুৎ।'

'তুমি বড্ড রেগে গিয়েছো পিসিমণি, তাই ভাবলে ও বললে ধ্যুৎ। আসলে ও বলছে ভুক্। কদিন ধরেই লক্ষ্য করছি কোনো কথা ওর পছন্দ না হলেই ও বলে উঠে ভুক্।'

'তুই এখনও ওকে চিনতে পারিসনি বাপি। তবে হ্যাঁ, ওকে কি করে শিক্ষা দিতে হয় সেইটে আমি দেখিয়ে দেবো।'

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই অবশ্যি লুসি টের পেয়ে গিয়েছে পিসিমণিই এ বাড়ির গার্জেন বটে। তাঁর কথা মতোই বাড়ির সবাই ওঠবোস করে, এমনকি লুসির বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটে না।

লুসিকে দিনে একবার করে খেতে দেওয়া হচ্ছিল এতদিন। পিসিমণি এসে সেই নিয়ম ভঙ্গ করে রাত্তির বেলায়ও খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। এক রাত্তিরে বাপি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে রাত দশটা বাজতে না বাজতে লুসি কেমন কুণ্ডুলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তা ঘুমোবে না কেন, পিসিমণি লুসির জন্যে রাত্তিরে যে ভূরিভোজের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বাব্বা!

লুসির সামনে পৌঁছে বাপি বলে, 'ভর সন্ধ্যেয় খুব যে ঘুমিয়ে পড়লি লুসি। ওঠ। বাড়িটাড়ি কে পাহারা দেবে শুনি?'

অনেক কষ্টে মাথাটা তুললো লুসি। তারপর লাল লাল চোখ মেলে বাপির দিকে তাকিয়ে বললো, 'চুপ।'

'এ্যাঁ!' রাগে বাপির সারাটা শরীর তখন কাঁপছে। সে হন হন করে চলে গেলো পিসিমণির ঘরে। পিসিমণি তখন মহাভারত নিয়ে ব্যস্ত। বাপিকে ঘরে ঢুকতে দেখে বললেন, 'এই যে বাপি সোনা, কী মনে করে?'

'তোমার আস্কারা পেয়ে পেয়ে লুসি যাকে তাকে যা নয় তাই বলছে।'

'ওমা, লুসি কথাও বলছে নাকি আজকাল?'

'ও নাক ডেকে ঘুমোচ্ছিল, আমি ওকে তাই বকেছিলাম একটুখানি। ও আমায় বললে চুপ।'

'তুই বড্ড রেগে গিয়েছিস বাপি, তাই ভাবলি ও বলছে চুপ। আসলে ও বলছে ভুক্। তুই-ই তো বলেছিলি, কোনো কথা ওর পছন্দ না হলেই ও বলে ভুক্।'

নিজের বলা কথার ফাঁদে নিজেই জড়িয়ে গিয়েছে বাপি। সঙ্গে সঙ্গে সে প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। বলে, 'পিসিমণি, লুসিকে এভাবে গাদা গাদা খাওয়ানোটা কী ঠিক হচ্ছে?'

'গাদা গাদা আর খাচ্ছে কোথায় বল! এই তো গোটা পাঁচেক রুটি, চার পিস মাছ, আর হাড় ক'খানা। রাত্তিরে দই খাওয়াটা ঠিক নয় বলে তাও দিইনি। তবে কিনা শেষপাতে একটুখানি দুধ ভাত খেতে লুসি ভারি ভালোবাসে, তাই চাট্টি দিতেই হলো।'

'লুসির খাওয়াটা কী একটু উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে না, পিসিমণি?'

'বলছিস।'

সত্যি বটে লুসির খাওয়াদাওয়ায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন পিসিমণি। স্বাভাবিক মাংস ভাত - রুটির সঙ্গে ডাঁটাচচ্চড়ি, শুকতো, লাউয়ের ঘন্ট সবই তিনি লুসির পাতে অম্লানবদনে পরিবেশন করে থাকেন। লুসির ফুড হ্যাবিটও আস্তে আস্তে পাল্টে যেতে শুরু করেছে। বেশ তৃপ্তির সঙ্গে সে ডাঁটাচচ্চড়ি চিবিয়ে চিবিয়ে খায়। পিসিমণি নিপাট ভালোমানুষের মতো বলেন, 'কুকুরের উপর একখানা বই যোগাড় করে নিয়ে আয়। সেই বই থেকে একটা সুষম খাদ্যতালিকা তৈরি করে দেবো। ঠিক আছে।'

তারপর কেটে গিয়েছে আরো ক'টা দিন। একদিন দুপুরবেলা বাপি অবাক হয়ে দেখে লুসি কেমন চিবিয়ে চিবিয়ে পান খাচ্ছে। লুসিকে যেন থুক করে পানের পিকও ফেলতে দেখলো বাপি। ধুস্, লুসির বারোটা বেজে গিয়েছে। একটা কুকুরের যে এতটা অধঃপতন হতে পারে লুসিকে না দেখলে সেকথা বিশ্বাস করা শক্ত।

খুবই হতাশ হয়ে গিয়ে বাপি স্থান ত্যাগ করার উদ্যোগ করতেই শুনলো লুসি বলছে, 'শোন।' ঝটিতে ঘুরে দাঁড়ালো বাপি। কিন্তু না, মনে হলো অনভ্যাসে একবার কেশে ফেলেছে মর্কটটা। বাপি তবু জিজ্ঞেস করলে, 'আমায় কিছু বললি।' লুসি চুপ। বাপি বললে আবার, 'বুড়ো মানুষের মতো বসে বসে পান চিবুচ্ছিস, লজ্জাও হয় না তোর।' লুসি বললে, 'ফুট।' শুনেই রাগে জ্বলে ওঠে বাপি। 'তবে রে পাজি', বলে কোত্থেকে একখানা লাঠি যোগাড় করে তেড়ে আসে। লুসি একছুটে পালিয়ে যায় পিসিমণির ঘরে। পিছু পিছু বাপিও এসে উপস্থিত। লুসি ততক্ষণে পিসিমণির খাটের নিচে আশ্রয় নিয়েছে, আর খাটের নিচে থেকে উঁকি মেরে বাপিকে দেখছে।

পিসিমণি খাটে বসে কি যেন সেলাই করছিলেন। প্রথমে তিনি লুসিকে পালিয়ে আসতে দেখলেন, পেছনে পেছনে বাপির রণংদেহী মূর্তিটাও তাঁর নজরে এলো। বাপিকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'কী হয়েছে রে বাপি, তোর মুখখানা এমন আগুনপানা হয়ে রয়েছে কেন?'

'দেখ পিসিমণি, তোমার লুসিকে একবার সমঝে দিও, ওর অসভ্যতা আমি মোটেই সহ্য করবো না। বুড়ো মানুষের মতো পান চিবুচ্ছিল বলে আমি বকাঝকা করেছিলাম, আমায় বললে কিনা ফুট।'

'কুকুরে কখনো কথা বলে রে?' পিসিমণি অবাক মানেন। 'লুসিটা এক এক সময় এক এক রকম শব্দ করে ফেলে, সেটাকেই কথা বলে ভুল করছিস তুই। তাছাড়া পান খাওয়ার জন্যে ওকে দায়ী করাটাও ঠিক নয়। আসলে ওর একটু অম্বল মতো হয়েছিল,

লুসির খাওয়াদাওয়ায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন।

আমিই হাতে ধরে ওকে পান খেতে দিয়েছি। ওকে কী আর রোজ রোজ পান খেতে দেবো ভেবেছিস?'

'পিসিমণি, পানের পর একটুখানি তামাক, কেমন হয়?'

'সেই চেষ্টাও করে দেখেছিলাম। ওর পেটে বিস্তর গ্যাস হয়েছে। বিষে বিষক্ষয়। হুঁকো সাজিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু হতভাগী পারলে না।'

'এ্যাঁ ! তুমি সেই চেষ্টাও করেছিলে? ওরে বাপরে! আমার মাথা টলছে। পিসিমণি, লুসিকে আমি তোমায় দান করে দিলাম। সম্পূর্ণ নিঃশর্তে দান। আমি যাই।' বলে বাপি হনহন করে নিজের ঘরের দিকে রওনা হয়। পিসিমণির মুখের দিকে তাকালে বাপি দেখতে পেত পিসিমণির ছোট্ট মুখখানিতে একটুখানি মিষ্টি হাসি ফুটে উঠেছে।

তারপর আরও অনেকদিন কেটে গিয়েছে। লুসির চরিত্রগত পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনাই বাপির নজরে পড়লো না।

একদিন কাকভোরে আচমকা ঘুম ভেঙে যায় পিসিমণির। কে যেন উঁ উঁ শব্দে একটানা কেঁদে চলেছে! ঘুমঘোরে দু'একবার লুসির হাঁকডাকও যেন শুনতে পেয়েছিলেন তিনি। তাই তো! উঠে গিয়ে ঘটনাটা একবার যে দেখতে হয়। কে কাঁদে, কেন কাঁদে! আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে তিনি দরজার খিল খোলেন। হুম্ কান্নার শব্দটা চিলেকোঠার দিক থেকে আসছে বটে। পিসিমণি এক পা দু'পা করে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যান। ও মা! সিঁড়ির গোড়ায় শুয়েছিল যে লুসিটা, তাকে তো কোথাও দেখা যাচ্ছে না! অবশ্যি ছাদের দরজাটা পিসিমণি খোলাই রাখেন যাতে কাকভোরে ঘুম থেকে উঠে লুসি ছাদে খানিকটা মর্নিংওয়াক সেরে রাখতে পারে। কান্নার শব্দটা আবার ঐ ছাদের দরজা দিয়েই নিচে নেমে আসছে। পিসিমণি এক পা এক পা করে উঠে আসেন ছাদের উপরে।

চিলেকোঠার পাশেই ঠাকুরঘর। ঠাকুরঘরের দরজাটা খোলা। তালা পড়ে আছে দোরগোড়ায়। নির্ঘাৎ চোরের কাজ। কান্নার শব্দটাও আসছে ঐ ঠাকুরঘর থেকেই। পিসিমণি দূর থেকে উঁকি মেরে ঠাকুরঘরের ভেতরে লুসিকে দেখতে পান। তারপর ঘরের সামনে পৌঁছতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। চোর ঢুকেছে বটে ঠাকুরঘরে। সেই চোর আপাতত বসে আছে লুসির পায়ের কাছে। চোরের একখানা হাত তখনো রয়েছে সিংহাসনে আসীন সোনার গোপালের গায়ে। তার মুখ থেকেই বেরিয়ে আসছে একটানা কান্না। মাথা ঘুরিয়ে পিসিমণিকে একবার দেখে নেয় লুসি, তার চোখে দিগ্বিজয়ের হাসি।

পিসিমণি এবার চোরটিকে ভালো করে দেখতে থাকেন। তার গায়ের রং খুবই কালো, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, ঝকঝকে সাদা দাঁত। পরনে হাঁটু অব্দি রুলের একটা ধুতি। উদোম গা, সারা গায়ে হাতে পায়ে জবজব করছে সর্ষের তেল। হুঁ, সিঁদেল চোর বটে। চোরটা তখনো একটানা কেঁদে চলেছে। তাকে লক্ষ্য করে পিসিমণি বিরক্ত গলায় বলেন, 'তোমার কী আর কাঁদার বয়স আছে, বাছা?'

চোরটা কাঁদতে কাঁদতেই উত্তর দেয়, 'কান্না বন্ধ করলেই কুকুরটা যে আমায় ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে মা জননী।'

'তাহলে কাঁদ।' পিসিমণি মাথা কাৎ করে সম্মতি জানান। 'কাঁদতে থাকো। আমি বরং সবাইকে ডেকে নিয়ে আসি। তুমি কিন্তু পালিয়ে যেতে চেষ্টা করো না বাপু। তাহলে লুসি যা করবে সেজন্যে কিন্তু আমি দায়ী হবো না, বলে দিচ্ছি।'

পিসিমণি একে একে সবাইকে ডেকে তুললেন ঘুম থেকে। তারপর একটা মিছিল আস্তে আস্তে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলে। সর্বাগ্রে রয়েছেন পিসিমণি, তারপর খোকা ব্যানার্জি, বাপির মা আর বাপি। সবাই এসে ভিড় জমায় ঠাকুরঘরের দোরগোড়ায়। পিসিমণি খুশি খুশি গলায় বলেন, 'দেখলি বাপি, লুসি সোনা কেমন কাজের মানুষ।'

'গর্ধব!' খোকা ব্যানার্জি ধমকে ওঠেন।

পিসিমণি চমকে উঠে তাকান ভাইয়ের দিকে। তারপর এক চিক্কুর ছাড়েন, 'খোকা, তোর এত বড় সাহস আমায়...'

'পাষণ্ড কোথাকার!' খোকা ব্যানার্জির চোখ তখন চোরটার দিকে।

পিসিমণি নিজের ভুলটুকু বুঝতে পেরেও ভাইকে লক্ষ্য করে বলেন, 'খোকা, কাকে চোটপাট দেখাচ্ছিস তুই। জানিস, এই চোরটা আমার।'

'এ্যাঁ! তুমি চোরও পুষবে নাকি।'

'নয় কেন, লুসি ধরেছে যখন এই চোরের মালিকানা আমায় বর্তেছে। ওকে বকতে হয় আমি বকবো, মারতে হয় আমিই মারবো।'

'এ্যাঁ! পরের ছেলের গায়ে হাত দেবে তুমি?' খোকা ব্যানার্জি হতবাক। 'এই, তোর নাম কিরে?'

'এজ্ঞে বৃকেশ্বর।'

'তা সোনার গোপালের গায়ে হাত দিয়ে বসে আছিস কেন?'

'এজ্ঞে হাত সরাতে চেষ্টা করেছিলুম বার কয়েক, উনি তেড়ে এলেন।'

বাপিকে লক্ষ্য করে খোকা ব্যানার্জি বলেন, 'যা তো বাপি, লেকটাউন থানায় একটা ফোন করে দে। পুলিশ এসে ওকে হাতকড়া পরিয়ে ধরে নিয়ে যাক।'

'আবার থানা-পুলিশ কেন?' পিসিমণি শান্ত গলায় বলেন। 'ওকে সাজা দেওয়ার ভারটা আমার উপর ছেড়ে দে খোকা। লুসি—' পিসিমণি আদুরে গলায় লুসিকে কাছে ডাকেন, 'ওকে নিয়ে নিচে চল।'

অতঃপর আবার একটা মিছিল সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলে। পায়ে পায়ে সবাই এসে থামে একতলার বারান্দায়। বৃকেশ্বর বারান্দার এক কোণায় জড়সড় হয়ে বসে থাকে। পিসিমণি এক টুকরো পুরনো কাপড় বৃকেশ্বরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, 'হাত পায়ের তেলটেল মুঝে নাও বাবা বৃকেশ্বর, ও আর কোনো কাজে লাগবে না।' অগত্যা সে কাজেই সে মনোনিবেশ করে। কিছুক্ষণ পর একখানা রেকাবিতে জলখাবার সাজিয়ে নিয়ে আসেন বাপির মা। বিনা প্রতিবাদে জলখাবার গলাধঃকরণ করে বৃকেশ্বর। কোত্থেকে একখানা কোদাল তুলে নিয়ে এসে পিসিমণি ঠক করে নামিয়ে রাখেন বৃকেশ্বরের কাছে। তারপর বলেন, 'আর আলস্য নয় বাবা বৃকেশ্বর। যাও, ঐ যে ওখানে মাটি কুপিয়ে মাটিটা একটু চাষের যোগ্য করে দাও। প্রতিবারে ওখানে ডাঁটার চাষ করি আমি। যাও কাজে নেমে পড়। লুসি তোমার পাহারাদারি করবে।'

তারপরই সেই অপূর্ব দৃশ্যটি দেখা যায়। ঘেমে নেয়ে মাটি কুপিয়ে চলেছে বৃকেশ্বর। কাছেই দেওয়া হয়েছে একখানা চেয়ার। চেয়ারের পেছনে বাঁধা একখানি লম্বা লাঠি। লাঠির সঙ্গে আবার বাঁধা হয়েছে একখানা ছাতা। সেই ছাতা চেয়ারে ফেলেছে ছায়া। ছায়াঘেরা চেয়ারে বসে আছে আর কেউ নয় স্বয়ং লুসি। চেয়ারে বসে বসে সে বৃকেশ্বরের কাজ তদারকি করছে।

দুপুরবেলায় আবার একখানা থালা সাজিয়ে খাবার দেওয়া হয়েছে বৃকেশ্বরকে। খাওয়াদাওয়ার পর পাক্কা একঘন্টা বৃকেশ্বরকে বিশ্রাম নেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন পিসিমণি। বিশ্রামান্তে আবার কাজ। বেলা চারটে নাগাদ জমি তৈরি।

পিসিমণি ট্রাঙ্ক ঘেঁটে একটা কাগজের মোড়ক নিয়ে এলেন। মোড়ক খুলতে বেরিয়ে এল খয়েরি রঙের কিছু ডাঁটার বীজ। সুনিপুণ দক্ষতায় পিসিমণি সেই বীজ জমিতে ছড়িয়ে দিলেন। বৃকেশ্বর জল ছিটিয়ে জমিকে চাষের উপযোগী করে দিলো। এবার ছুটি। অতঃপর লুসিকে লক্ষ্য করে পিসিমণি বলেন, 'বুঝলি লুসি, সারাদিন কী হাড়ভাঙ্গা খাটুনিই না খেটেছে তোদের এই বৃকেশ্বর। এবার যে ওকে ছেড়ে দিতে হয়। কী বলছিস, যাবে? তোর অনিচ্ছেয় তো আর ওর যাওয়া চলতে পারে না।'

লুসি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো। যেন বলতে চাইল তুমি ছেড়ে দিতে চাইছো যখন, দাও ছেড়ে, আমার কিন্তু বাপু এতে সম্মতি নেই।

'লুসি, এবার হাত পা ধুয়ে খেতে বসবি চল।' পিসি এবার অন্য রাস্তায় হাঁটেন। 'গরম গরম চাট্টি ভাতই আজ তোকে খেতে দেবো ভাবছি। সঙ্গে অ-নে-কটা মাংস।'

মাংসের নাম শুনে লুসির জিবে জল গড়ালো বোধহয়। সে মাথাটা ঘষতে লাগলো পিসিমণির গায়ে। পিসিমণি শাড়ির আঁচলের খুঁট খুলে দু'খানা দশ টাকার নোট বৃকেশ্বরের হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'নাও বাবা বৃকেশ্বর, তোমার মজুরি। তুমি তো বাপু খেটে খেলেই পারো।'

বৃকেশ্বরের মুখে এই প্রথম একটুখানি হাসির ছোঁয়া লেগেছে। সে মাথা নেড়ে বললে, 'এজ্ঞে।' বাড়ির সবার চোখের সামনে গেট খুলে বৃকেশ্বর বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ালো। প্রথমে সে ঠকাস করে একটা প্রণাম ঠুকলো গেটের গায়ে, তারপরই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাল।

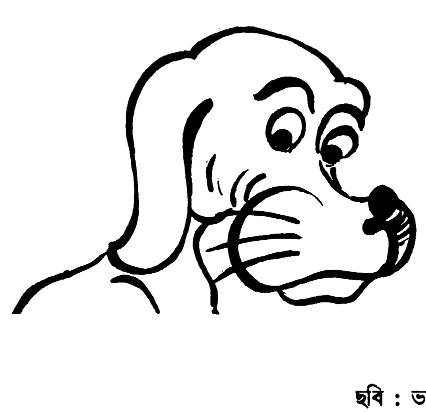

ছবি : ভাস্কর ঘটক

হাঁদা-ভোঁদার
চাপড় মেশিন
হুররাহ! আমাদের নতুন ফুটবল দিয়ে আমরা চতুর্দিকে দুর্দান্ত কিক নিতে পারবো।
ওফ্!
অ্যাই! রাস্তার ওপর ফুটবল খেলা এখুনি বন্ধ কর।
ওরে হাঁদা! পেছনে শান্তিরক্ষক দাদা। ধরলে অশান্তি করে ছাড়বে, শিগগির পালা!
বাড়িতে ফিরে
অনেকক্ষণ থেকে হতচ্ছাড়া নীল মাছিটা জ্বালাচ্ছে। তাড়াতে পারছি না। একটা উপায় বের করনা।
ঠিক আছে, পিসেমশাই। হতচ্ছাড়াকে শায়েস্তা করার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।
আমি পিসেমশাইয়ের জন্যে একটা লম্বা হাতলওয়ালা অটোমেটিক চাপড় মেশিন তৈরি করে দিচ্ছি।

এটাই সঠিক জিনিস, হাঁদা! আমি এটা ঠিকভাবে চালাতে চেষ্টা করবো।
ওরা আবার খেলতে বেরোবে। তাই পরেরবার ওদের ধরার জন্যে আমি এই ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকি!
গোদা নীল মাছিটা ঐ ঝোপের মধ্যে নেমেছে! এই নে হতচ্ছাড়া!
এইযে! মতলবটা কি?
ওঁক্‌ৎ!
ওয়াফস্! আঁউফস্! উফস্!
মরেছে! পিসেমশাই তো চাপড় মেসিন দিয়ে মাছি তাড়া করছিলো এখন শান্তিরক্ষক পিসেমশাইকে তাড়া করেছে!
গরর্! মর্কটটা গেলো কোথায়? ওর ছাল ছাড়িয়ে ডুগডুগি বাজালে তবে আমার মনের ঝাল মিটবে!
খবর্দার! আমি কোথায় আছি সেটা বলবি না!

নতুন ধাঁধা

১। রন্ধনের আগে মেলে
তরকারিতেও পাই,
শহরে বাজারে মেলে
কিন্তু কলকাতাতে নাই।

—মায়া ও রুমা মণ্ডল
রানীগঞ্জ/বর্ধমান

২। যাহা দিলে মাখন নয়, বাহির হয় ছানা,
না থাকিলে যাহার সাথে যাহা হয় কানা,
ফুটকি দেওয়া ছয়কে দিয়ে করলে তাদের ভাগ
জন্ম নিয়ে নষ্ট করি পূজা যজ্ঞ যাগ।

—সুবলচন্দ্র মজুমদার
গুপ্তিপাড়া/হুগলী

৩। পকেটে মেলায় কবি
মনের মতন সবি।

—বিভাংশু দত্ত
পল্লীশ্রী/আরামবাগ

৪। দুই বর্ণ গাত্রবস্ত্র
এক অর্থে মাছ,
এক অর্থে বাসস্থান,
অন্য অর্থে গাছ।

—প্রশান্ত, সুশান্ত, শ্রীকান্ত, সৌমিত্র
গৈরা/বাঁকুড়া

শ্রাবণ সংখ্যার শব্দমালার উত্তরঃ

পাশাপাশিঃ

১। পদ্মানদীর মাঝি	৯। চাড়া	১৫। তদারক
৫। নল	১০। নীরস	১৬। বর
৬। ব্যাল	১২। নমক	১৭। কাল
৭। চণ্ডাশোক	১৪। মত	১৮। জীবনানন্দ দাস

উপর নিচঃ

১। পঙ্কিল	৬। ব্যাপন	১৩। মতলব
২। নড়াচড়া	৮। শোণিত	১৪। মকরন্দ
৩। মানকর	৯। চাকদা	১৬। বয়স
৪। ঝিল	১১। সমর	১৭। কাজী

শ্রাবণ সংখ্যার নতুন ধাঁধার উত্তর
১। মেঘ ২। কচুরি ৩। সূঁচ ৪। মূলক

বলো তো আমি কে

সূত্র হেঁয়ালি

এক বিখ্যাত গল্পের চরিত্র আমি। আমার পরিচয় পেতে হলে নিচের সূত্রগুলো দেখ।

সূত্র একঃ ছোট থেকে যাঁর কাছে দাসত্ব করতাম দেনার দায়ে তিনি আমাকে আর আমার স্বজাতি একটি ছোট ছেলেকে হেলীর কাছে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন।

সূত্র দুইঃ ছোট ছেলেটির মা তাকে নিয়ে পালায়। মনিবের কথা ভেবে আমি পালাই না। শেকলে বেঁধে আরো কয়েকজন স্বজাতির সঙ্গে আমাকে তোলা হয় স্টিমারে।

সূত্র তিনঃ স্টিমারে আমার আলাপ হয় একটি ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে। জলে ডুবে-যাওয়া থেকে তাকে বাঁচানোর জন্য মেয়েটির বাবা আমাকে কিনে নেয়।

সূত্র চারঃ নিউ অর্লিয়েন্সে তাদের বাড়িতে শুরু হলো আমার নতুন জীবন। ছোট মেয়েটির ভালবাসা আর নতুন মনিবের সদয় ব্যবহার আমার সব দুঃখ ভুলিয়ে দিল

সূত্র পাঁচঃ এত সুখ আমার বেশিদিন সইল না। গুরুতর অসুস্থ হয়ে ছোট মেয়েটি চিরবিদায় নিল। বাবাকে বলে গেল দাসত্ব থেকে যেন আমাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

এবার বলো তো আমি কে? প্রথম সূত্র থেকে যদি আমাকে ধরতে পার তাহলে বলব অসাধারণ; দ্বিতীয় সূত্র থেকে বললে চমৎকার; তৃতীয় সূত্র খুব ভাল; চতুর্থ সূত্র ভাল; আর পঞ্চম সূত্র থেকে হলে মোটামুটি। আমার নাম? পরের পাতায় দেখ।

নতুন শব্দমালাঃ

[এবারের শব্দমালা **'নজরুল স্মরণে'**। সূত্রের শব্দটি কতগুলি অক্ষরের হবে তা বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া আছে আর উত্তরের শব্দটি যেখানে শেষ হবে সেখানে মোটা লাইন দিয়ে ঘেরা আছে।]

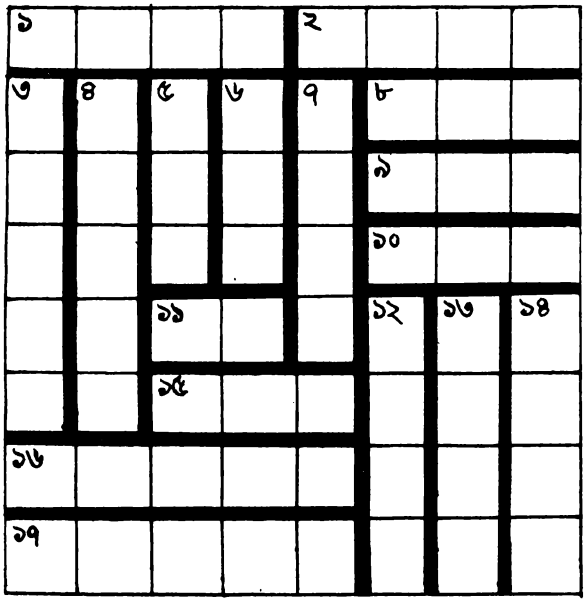

এটি তৈরি করেছেনঃ স্বপনকুমার পাত্র, বাসুদেবপুর, আরামবাগ

সূত্রঃ

পাশাপাশিঃ

(১) কবির স্মৃতিবিজড়িত গ্রাম

(২) নজরুল বাল্যকালে এ নামেও পরিচিত ছিলেন

(৮) তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা (সাপ্তাহিক)

(৯) যে কবিতায় কবি কোনো আইন মানেননি

(১০) 'প্রবাসী' ছাড়া আর যে পত্রিকায় 'বিদ্রোহী' ছাপা হয়েছিল

(১১) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতে কবির রচিত গান

(১৫) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ঋতুনাট্যটি কবিকে উৎসর্গ করেন

(১৬) 'আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে...' যে কাব্যে আছে

(১৭) 'নূরজাহান!—সিন্ধুনদীতে ভেসে এলে....'

উপর-নিচঃ

(৩) কবির যে কাব্যগ্রন্থটিকে ইংরাজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিলেন

(৪) কবির মাথার রোগ সারাতে ব্যর্থ ভিয়েনার ডাক্তার

(৫) বিদ্রোহী-কবি-পত্নী

(৬) নজরুল যেখানে '৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টন'-এর হাবিলদার ছিলেন

(৭) কবি সম্পাদিত দৈনিক পত্রিকা

(১২) গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ চরিত্রগুলি তাঁর যে নাটিকায়

(১৩) নসিব মিয়া, রুস্তম, নূরজাহান চরিত্রগুলিকে নিয়ে লেখা নজরুল-গল্প

(১৪) এ পাখিটি বিদ্রোহী-কবি-পুত্র!

ফাল্গুন সংখ্যার বাকি উত্তরদাতাদের নাম

॥ হাওড়া ॥

চন্দ্রশেখর ও নতুন মান্না/বাজে শিবপুর রোড; সুদীপ, কাকলি, সবুজকলি, বাচ্চু, তুলতুল ও শুভ/নীলমণি মল্লিক লেন; শুভদীপ, রূপপর্ণা, ঋতুপর্ণা, স্নেহপর্ণা, অনির্বাণ ও দেবনিকা/দক্ষিণ পাড়া, আন্দুল; সৌরভ, সম্রাট ও প্রণব মণ্ডল/তেঁতুলকুলি; অমিতাভ, অরুণাভ, অনামিকা, অনন্যা, আকাশ ও অরিন্দম/সদর বক্সি লেন; বাবুন, ফুচি, বোনা, সাম, পম্পু, রাজা পাপা, রুমা, সোমা, লাল্টু, খোকন, খুকু ও ভোঁদাই/দানু বোস লেন; বুবুল, পিংকি, মিঠু ও সুশীল দাশ/উত্তর খুরুট; সমীরচন্দ্র মহাপাত্র/আরুপাড়া; নির্মলেন্দু ঘোষ ও রমেশচন্দ্র দত্ত/ডোমজুড়; দিদা, মা, বাবা, ঝুম ও ঝন্টু হাজরা/পঞ্চাননতলা; শুভদীপ, শুভ্রা ও দিলীপ হালদার/শিবপুর; সৃজন, রীনা ও বিদ্যুৎ নাথ/শিবপুর; মৌলি, সৌরভ ও সোনালী ব্যানার্জী/ শিবপুর;

॥ হাওড়া ॥

কৌশিক ও শান্তা সরকার/বাকসাড়া; দীপমালা ও কিংশুক দাঁ/শালকিয়া; শুভ্রনীল, সায়ন্তী, সিদ্ধার্থ, বর্ণালী ও পিয়ালী/বেতড়; রঞ্জন বসু/সাতকড়ি চ্যাটার্জী লেন; যূথিকা, বীথিকা, সুপ্রভা, সুপর্ণা, প্রমদা ও দীপ্তীশ কপাট/গুড়েপোল; অর্ণব ও ঊর্মিমালা ভট্টাচার্য/পি. কে. ব্যানার্জি রোড; কৃষ্ণা ও দেবজ্যোতি মিত্র/হাওড়া ফায়ার সার্ভিস স্টেশন;

॥ হুগলী ॥

ঈশান, সুরঞ্জনা, সুনীতি ও অশোককুমার মুখার্জী/মাহেশ; অমিতকুমার পাল/বৈদ্যবাটী; রিম্পি, টিটু ও সোমা/মাহেশ; প্রদীপ ও মিনতি দে/উত্তরপাড়া; রনি, পিউ, বিটু ও জুলি/রিষড়া; স্বপ্না ব্যানার্জী/ত্রিবেণী;

॥ হুগলী ॥

সুনেত্র বন্দ্যোপাধ্যায়/ শ্রীরামপুর; মিতালী, মীরা, পার্থ ও কনক ব্যানার্জী/বরিদুহাটি, চণ্ডীতলা; পার্থ, পাপ্পু, হাবু, ভুলু ও তুহিন/পাণ্ডুয়া; রীমা ও বিশ্বজিৎ শর্মা/চুঁচুড়া;

॥ বর্ধমান ॥

সৌম্যশান্ত, অভীচিত, নবনীতা ও পার্থ ঘাঁটি/আসানসোল; রূপশ্রী, কুন্তল, স্বাগতা, সুনন্দা, সুতপা চ্যাটার্জী ও সুমনা দত্ত/দুর্গাপুর; প্রণবকুমার মণ্ডল/দুর্গাপুর; পাপু, শিল্পী ও পৌলমী মিত্র/ছোট নীলপুর; চিত্রলেখা, সৌম্য ও বিশ্বদীপ সেনগুপ্ত/কুলটি; সৌরদীপ্ত পাল/আসানসোল; শুভ্র চৌধুরী, অভিজিৎ ও অরিজিতা সরকার/মিঠানী; মিনতি মণ্ডল/বেনাচিতি; বাসবী, শতভিষা, যশোধরা ও ডাঃ উত্তমকুমার বটব্যাল/পাটমোহনা; রঘুনাথ, ইন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ ও মৈত্রেয়ী তেওয়ারী/আসানসোল; ইঙ্গিতা, জয়িতা, অর্পিতা, অর্চনা ও জলি ভট্টাচার্য/আসানসোল; বিম্পি, বিটু, রিয়া, এষা, পুঁচি, মন্টি ও দীপ/দুর্গাপুর; শিবাদিত্য, সুচন্দনী ও সীমন্তিনী চক্রবর্তী/ফলবিল মাঠ; ঋষি, শ্রী, সু ও বুয়ান/খালুইবিল; খোকা, টুকুন ও টুলু/দুর্গাপুর; শিল্পী, বাপ্টি, সুজিত, বিশ্বজিত ও আভা/কুইলাপুর, সূর্যনগর; টুটুন, সুভাষ, বাবা ও মা/দুর্গাপুর; রামেশ্বরী, মঞ্জু ও শিবদাস দত্ত/ সিঙ্গারকোণ; চন্দন রায়/বাদামতলা; জ্যোতির্ময় হাজরা/এ. সি. মিত্র লেন; অজিতকুমার ঘোষ/আসানসোল।

॥ বাঁকুড়া ॥

সুমন দাস/বিষ্ণুপুর; সোমনাথ ও মণিদীপা রায়/ বিষ্ণুপুর; সিদ্ধার্থ, ফাল্গুনী, অর্ণব,

বলো তো আমি কে-এর উত্তরঃ

আমি হলাম হ্যারিয়েট বীচার স্টো-র লেখা 'আঙ্কল টমস কেবিন'-এর টম কাকা।

স্মিতা ও অনীতা মুখোপাধ্যায়/অর্ধগ্রাম; পাপাই ও রাখী/কেন্দুয়াডিহি; বড়দা, নীলু, আলু, পুঁচকে, সন্দীপ, ছোটন, দীপক ও পার্বতী/মুড়াকাটা; আশামুকুল রায়/বিষ্ণুপুর; মল্লি, পাপুন ও বুবাই/সোলতুবকা, দোলতলা; তপতী ও তাপসী খাঁড়া/বিষ্ণুপুর; অভিষেক ও শুভ্রা পাল/পালিতবাগান; শরকৃষ্ণ চষ্টসূর্য ও প্রতিমা দে/বিষ্ণুপুর; সোমা, চিরঞ্জীব, অরিন্দম রায় ও অনির্বাণ মজুমদার/মোলড়ুবকা; বিকাশ, আকাশ ও মীনা রায়/মেজিয়া; শিখা ভাণ্ডারী/ পিরিতচক. রায়বাঘিনী;

॥ মেদিনীপুর ॥

বিপ্লব মণ্ডল/গড়বেতা; সোমা, সাথী, সুনন্দা ও দেবযানী রায়/ গড়বেতা; সুরজিৎ ও সুপর্ণা কোলে/খড়গপুর; ঋতুপর্ণা ধর/খড়গপুর; পার্থ, বিল্টু ও ছট্টু/কাঁথি; পারমিতা ও প্রণমিতা প্রধান/মিত্র কম্পাউন্ড; দ্বিজপদ সরদার, শ্যামল চ্যাটার্জী ও বি. হেম্রাম/খড়গপুর;

॥ মেদিনীপুর ॥

স্বাতী, বোধিসত্ত্ব ও সোনামণি মাইতি/মঠচণ্ডীপর; প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী/সুভাষ বসু রোড; অনিরুদ্ধ, নীলরুদ্র, শ্রাবণী ও কুম্পি/পাটনা বাজার; প্রণব, নন্দিতা ও অনুমিতা দাশ/কে.টি.পি.পি; সঞ্চিতা, সঞ্চয়ন, সন্তয়ন, অঞ্জলি ও হরেন দাস/তোটমালা; তমাল, দেবযানী, ইন্দ্রাণী, সায়ন ও অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়/খড়গপুর; ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ/দেউড়িবাড় কিরণপ্রভা বিদ্যামন্দির, শুকরল্লাপুর; সৌরভ, পৌলমী, শিবানী, পাপু, পপি ও শ্রীধর সামন্ত/কাখুদিয়াবাড়ি; তনু, বুনু, ছোটকা, জয়, খোকা, রীতা, নেড়া, মণি, সীতা ও মা/খড়গপুর; সুপ্তি ও স্বর্ণেন্দু নায়ক/গড়বেতা; বলরাম, শুভ্রা ও শুভায়ু ঘোষ/শরৎপল্লী; রাজেশ মুখার্জী/দীঘা;

॥ পুরুলিয়া ॥

সুশ্বেতা ও পল্লব ঘোষ/পশুপতি নিকেতন; নবারুণ সাহা/পুরুলিয়া জিলা স্কুল; কৌশিক ও বৈশাখী চৌধুরী/ নীলকুঠী ডাংলা; কল্পনা, বিকাশ, পলাশ, মিঠু, মৌসুমী ও চুমকি/লাগদা; আপ্পু, জিম্পু, সৌরভ, গৌরব, অলোকেন্দু, অমিতা, যূথিকা, বীথিকা, শিশির, অনিমা, টুম্পা, তৃপ্তি, বিকাশ ও গিরিধারি ব্যানার্জী/রঘুনাথপুর; সুমন ও সৈকত রক্ষিত/রঘুনাথপুর;

॥ পুরুলিয়া ॥

উজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল, রানা ও মোহন মণ্ডল/রঘুনাথপুর; সুনীতা, কাঞ্চু, বুলু ও কৃষ্ণা মণ্ডল/রঘুনাথপুর; সুবর্ণা, সন্দীপ, মৃন্ময়, তন্ময় মণ্ডল ও শান্তি মাজী/রঘুনাথপুর; সুমনা, পার্থ, হারাধন ও পূর্বালী ব্যানার্জি/ মানবাজার; দিলীপ, দেবাশিস, রেবা, অপর্ণা ও কৃষ্ণকিশোর ঘোষ/নেকড়ে;

॥ উত্তর ২৪ পরগনা ॥

রাজীব, অভিজিৎ ও সুব্রত দত্ত/দমদম; অনিমেষ, কৌশিক, সুজয় ও প্রতিমা দাস/আতপুর; বরুণ ও ভাস্কর দাশশর্মা/মণিরামপুর; শঙ্কর, কঙ্কর, শিপ্রা, গোপা ও মিঠু দে/বারাসাত; চম্পা, রিপন, পরশ, রাহুল, পালাশ ও বুলটি/বারাসাত; সমন ও সুদীপ দাস/বাদুড়িয়া; মৈনাক মুখার্জী/কাঁচড়াপাড়া; দীপান্বিতা দাস/বারাসাত; পরমা ও টুসকি ভট্টাচার্য/ নৈহাটি; বৈশালী, বর্ণালী ও শুভজিত সাহা, পল্লব ও প্রজ্ঞাপারমিতা কুণ্ডু/সোদপুর; উজ্জ্বল, কুন্তল, উৎপল, শ্যামলী বর্মণ, বাবা ও মা/রামেশ্বরপুর; রক্তিম ও উত্তরা মুখার্জী/বিরাটি; কুশল, শিউলি ও কৌস্তভ/ব্যারাকপুর; ব্রততী, রাজীব ও তোতা চৌধুরী/বামুনগাছি; সুদীপ্ত, সোম, বুবাই, টুবাই ও টিঙ্কু/টিটাগড়; প্রণব, মানাই, বোনো ও মানু/উস্তি; অনুপ, সুব্রতা, বাবুল ও প্রবীর/আগরপাড়া;

॥ দক্ষিণ ২৪ পরগনা ॥

পল্লব চ্যাটার্জী/নব ব্যারাকপুর; প্রলয়শঙ্কর ঘোষ/সোনারপুর; রবি, ছোটন, মুন্নি, রাজা, সঞ্জু, রাহুল, দীপালোক ও তন্দ্রা/সুভাষগ্রাম; ঋতুপর্ণা, মিনু, ঋত্বিক ও ঋতাসনা সরকার/বারুইপুর; সোনা, ববি, ঝিলম, তাতাই, বাবাই, পাকলু, তিতির ও তিন্নি/রামচন্দ্রপুর; অনাবিল ও সমীরকুমার ঘোষ/ডায়মণ্ডহারবার; তাপস ও তরুণকুমার মণ্ডল/হায়াত নগর, শিরাকোল; মোম, দোলা, বাবা ও মা/রাজপুর;

॥ দিনাজপুর ॥

শীর্ষেন্দু মজুমদার/রায়গঞ্জ;

॥ নদীয়া ॥

সোমা ও সৌমিত্র সর্দার/দেবগ্রাম; কমলা, অসীম, গোপাল ও অনুপম সাহা/কৃষ্ণনগর; অভিরূপ, বকুল ও সুলতা/নবদ্বীপ; ভিক্টর, সোবার্স, রেশমী ও রূপা/তালপুকুর; অমিত ও অসিত দালাল/মাজদিয়া; প্রিয়াঙ্কা, অভিষেক, ঈপ্সিতা, অলোক বোস ও হিরণ ঘোষ/রানাঘাট; সৌরভ, পার্থ ও সুমন/ ফুলিয়া কলোনী; রিনি, সুবীর ও শর্মিলা/রানাঘাট;

চৈত্র সংখ্যার নতুন ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নাম

॥ কলকাতা ॥

মা, ঝুনি, কুশাল ও মৃণাল চক্রবর্তী/এল-২, কোল ইন্ডিয়া কমপ্লেকস, বাঘা যতীন; বুবাই ও সোমা কুণ্ডু/সিমলা রোড, মানিকতলা; অর্জুন ও অরুণ মিত্র/বাঙ্গুর এভিনিউ; সুইটি, বিউটি, সনি ও আমিন/তালতলা; রুমা, হি রা, মাখদুম/নারকেলডাঙা;

॥ হাওড়া ॥

অমিতাভ, অরুণাভ, অনামিকা, তায়না, আকাশ, অরিন্দম, রুমা ও দেবজ্যোতি/সদর বকসী লেন; রমেশচন্দ্র দত্ত ও নির্মলেন্দু ঘোষ/বারুইপাড়া, ডোমজুড়;

॥ বর্ধমান ॥

পাপু, পৌলমী ও শিল্পী মিত্র/ছোটনীলপুর;

॥ মেদিনীপুর ॥

দেউড়িবাড় কিরণপ্রভা বিদ্যামন্দির-এর ছাত্রছাত্রীবৃন্দ/শুকরল্লাপুর; শ্রীধর, শিবানী, সৌরভ, পৌলমী ও পপি সামন্ত/কাঘুরিয়াবাড়ি; মণিকা, সুপ্তি, স্বর্ণেন্দু ও সোমনাথ/গড়বেতা;

॥ মালদা ॥

সৌম্য সেনগুপ্ত/গৌড় রোড।

বৈশাখ সংখ্যার নতুন ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নাম

॥ হাওড়া ॥

অনন্ত, বিভা, ঝুম ও ঝন্টু হাজরা/ঝাঁপড়দহ; নবীন ও সুপ্রিয় / অধ্যয়ন সম্মিলনী; সম্রাট, সৌরভ ও প্রণব মণ্ডল/তেঁতুলকুলী; জয়, বাবা, মা, দাদু ও সুদীপ্ত ঘোষ/রথতলা; সাধনা, বিশ্বজিৎ ও দেবজিৎ চ্যাটার্জী/বি. গার্ডেন; মীরা, বিমান, রীতা, সব্যসাচী ও শতাব্দী মুখার্জী/গণেশ চ্যাটার্জী লেন; বিদ্যুৎ, রীনা ও সৃজন নাথ/শিবপুর; অভয়, অতনু, পূরবী, কাবেরী, অন্ত, নূপুর, শুভ, রিলি, মান্টু, রিন্টু, পার্থ ও পাপ্পু/উলুবেড়িয়া; প্রদীপ, অপর্ণা, কাবেরী ও কৃষ্ণা বসু/মধুসূদন বিশ্বাস লেন; বুবুল, পিংকি, মিঠু ও সুশীল/উত্তর খুরুট; সৌম, সৌরভ, সোনালী ও মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী/শিবপুর; দীপমালা, কিংশুক, তারকনাথ ও কাজল দাঁ/সালকিয়া; রূপক, পাপিয়া ও কাঞ্চন মাজী/শিবপুর;

৩ অনুবাদ সিরিজ

হ্যারিয়েট বীচার স্টোর

আঙ্কল টমস কেবিন

অনুবাদঃ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

দামঃ ১৬ টাকা মাত্র

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ

২১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯

বিজ্ঞানের খবর

সন্দীপ সেন

মহাবিশ্বে নতুন চোখ

'বঙ্কুবাবুর বন্ধু' গল্পটি তোমরা অনেকেই পড়েছ। অনেকেই সিনেমায় দেখেছ একস্ট্রা টেরিস্ট্রিয়াল জীব বা ই. টি.-কে। গল্পে সিনেমায় এইসব ভিন গ্রহের জীবদের দেখা মিললেও বাস্তবে এখনো বিজ্ঞানীরা তাদের উপস্থিতির কোনো প্রমাণ পাননি। তবে তাঁরা নানাভাবে তাদের খোঁজ করে যাচ্ছেন। চেষ্টা করছেন অনেক দূরের গ্রহে বসে তারা যদি কোনো সংকেত পৃথিবীর মানুষকে পাঠায়, সেই সংকেত ধরার। মহাকাশে তাই তাঁরা সব সময় চোখ ও কান খোলা রেখেছেন। মহাবিশ্বের রহস্যসন্ধানী এই চোখ-কান হলো রেডিও টেলিস্কোপ। ভারতের বিজ্ঞানীরাও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। পুনা থেকে মাত্র ৮০ কিলোমিটার দূরে তাঁরা তৈরি করছেন এক নতুন টেলিস্কোপ। এ বছরের মাঝামাঝি সেই টেলিস্কোপ তৈরির কাজ শেষ হয়ে যাবে। কাজ শেষ হলে সেটা হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় রেডিও টেলিস্কোপ। তাহলে বলা যায় ভারতীয় বিজ্ঞানীদের তৈরি এই চোখ-কানই হবে সবচেয়ে শক্তিশালী। ভিন গ্রহে কোনো জীব থাকলে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার সুযোগ আমরাই আগে পাব। দানিকেন সাহেবের কথা অনুযায়ী কোনো দূর গ্রহে যদি দেবতা নামে গ্রহান্তরের মানুষ থাকে তাদের সঙ্গে ভাব জমানো যাবে।

বিজ্ঞানীরা ঐ টেলিস্কোপটির নাম দিয়েছেন জায়েন্ট মিটার ওয়েভ রেডিও টেলিস্কোপ, সংক্ষেপে G.M.R.T.। প্রফেসর গোবিন্দস্বরূপের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় এটি তৈরি হচ্ছে। রেডিও টেলিস্কোপটির ডিশের ব্যাসার্ধ ৪৫ মিটার। শব্দ আসে ইথারের মাধ্যমে বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে। মহাশূন্যে বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ইথার তরঙ্গ প্রতিনিয়ত ভেসে আসছে যা সাধারণ গ্রাহকযন্ত্র ধরতে পারে না।. G.M.R.T. ২০ সেন্টিমিটার থেকে ৮ সেন্টিমিটার পর্যন্ত যে কোনো তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যই ধরতে পারবে

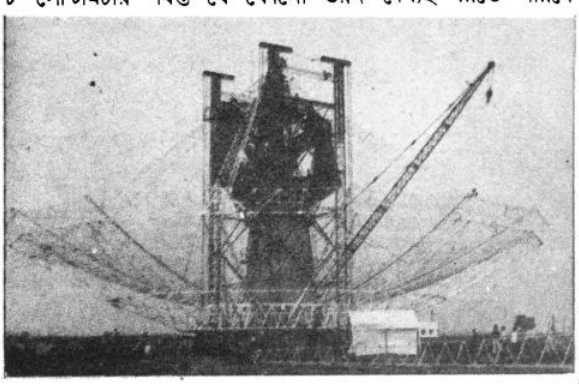

নিজস্ব ক্ষমতায়। ই.টি.রা যদি সত্যিই কোনো খবর পাঠায় তবে তা G.M.R.T-র চোখ-কান এড়াবে না। G.M.R.T. কেবলমাত্র বার্তা সংগ্রহই করবে না, সেটি বিশ্লেষণ করে তার মানেটাও জানিয়ে দেবে। এর ফলে জানা যাবে মহাবিশ্বের নানান অজানা তথ্য।

জলে ভেজে না যে ইঁট

ইঁট দিয়ে বাড়ি তৈরি হয়। কাদামাটি দিয়ে তৈরি ইঁটকে আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করে নিতে হয় যাতে সেটি নষ্ট না হয়। এরকম পোড়া ইঁটের ঢিপি থেকেই তো রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আবিষ্কার করেছিলেন মহেঞ্জোদারো আর হরপ্পা। এক কথায় যাদের বলা হয় সিন্ধু সভ্যতা। তার মানে ইঁটকে পুড়িয়ে শক্ত করে জলনিরোধক করা বেশ প্রাচীন ব্যাপার। তবুও ঐ ইঁটে ড্যাম্প ধরে, নোনা ধরে, চুঁইয়ে জল পড়ে। তাছাড়া ইঁট পোড়ানোর জন্য দরকার জ্বালানীর। জ্বালানীর পরিমাণ পৃথিবীতে ক্রমশ কমে যাচ্ছে। এতে পরিবেশও দূষিত হয়। এসব ভেবেই অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের ভিক্টোরিয়া ইনসটিটিউট অফ টেকনোলজির বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন এক আজব ইঁট। কাদা দিয়ে তৈরি ইঁটে জলে মেশানো একটি রাসায়নিক বস্তু ঢেলে দিলেই ইঁটটি হয়ে যাবে শক্ত, জলনিরোধক। ঐ ইঁটে তৈরি বাড়িতে ড্যাম্প ধরবে না, নোনা ধরবে না, চুঁইয়ে জল পড়বে না। রাসায়নিক বস্তুটির নাম সিলিকন মনোমারাস। পোড়ানো ইঁটের চেয়ে এই ইঁট দামেও সস্তা। ভারতবর্ষেও ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ থেকে পরীক্ষামূলক ভাবে এ জাতীয় ইঁট দিয়ে বাড়ি তৈরি আরম্ভ হয়েছে।

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ

স্বামী মুক্তিকামানন্দ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মাদ্রাজ থেকে হতোদ্যম হয়ে হায়দ্রাবাদ

সবকিছু মুলতুবী রেখে স্বামীজী হায়দ্রাবাদ চলে গেলেন। তখন ফেব্রুয়ারী মাস। হায়দ্রাবাদের গরম দেখে বুঝে নিলেন রাজস্থানে আরো কত বেশি গরম! স্বামীজী গরম একদম সহ্য করতে পারেন না। তাই উটী (উটকামান্ড)-তে কিছুদিন থাকবেন ভেবে মাদ্রাজে ফিরে বাঙ্গালোর যাওয়া ঠিক করলেন। তখন তাঁর মনে হয়েছিল বুঝি বিদেশ যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই আর নেই। খুব অন্তরঙ্গ শিষ্যদের তিনি চিঠিতে লিখলেন—মাদ্রাজের হুজুগে মেতে গিয়ে সময়টা অনেক নষ্ট করেছেন এবং এখন ভুল বুঝতে পারার পরও অর্থসংগ্রহের জন্য রাজপুতানা যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ সেখানে অত্যধিক গরম। অতএব ঈশ্বরের যা ইচ্ছা তাই পূর্ণ হোক! মায়ের কাজ মা হাতে ধরে করিয়ে নিলে তবেই তিনি মানবেন।

হায়দ্রাবাদের জনগণ আগেই খবর পেয়েছিল যে মাদ্রাজে এক বি.এ. পাশ সন্ন্যাসী এসেছেন। তিনি নাস্তিক, খ্রীস্টধর্ম নিতে চায় এমন সব যুবকদের নিজের শিষ্য করে নিচ্ছেন। তাঁর চমৎকার চেহারা, মুণ্ডিত মস্তক, ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল কথা বলেন। বিরুদ্ধ কথার পাল্টা জবাব দেবার অসাধারণ ক্ষমতা। যখন গান করেন মনে হয় ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছেন। স্বাস্থ্যবান ও রসিকতায় ভরপুর। স্বামীজীকে কেমন করে অভ্যর্থনা করা হবে, কোথায় রাখা হবে, সভা ডেকে এসব ঠিক করে হায়দ্রাবাদবাসীরা বিরাটভাবে প্রস্তুত হয়ে স্বামীজীকে গ্রহণ করল। হায়দ্রাবাদের বয়স্ক লোকেরা তো অবাক! একজন সন্ন্যাসীর জন্যে এমন রাজকীয় আয়োজন! এমনটি তো কেউ কোনোদিন কল্পনাও করেনি।

১১ ফেব্রুয়ারী। একশ জনের বেশি নেতৃস্থানীয় হিন্দু ফল, মিষ্টি, দুধ, ফুলের মালা নিয়ে স্বামীজীকে পূজা করে প্রার্থনা করলেন, যদি তিনি শহরের বিখ্যাত মহবুব মহাবিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন। রাজী হলেন স্বামীজী। তার আগে গৃহকর্তার সঙ্গে শহরের দ্রষ্টব্য স্থান দেখে বেড়ালেন। বেড়িয়ে ফিরে এসে একটি চিঠি পেলেন। চিঠিতে অনুরোধ করা হয়েছে যে, তিনি যেন হায়দ্রাবাদের নবাবমহলে গিয়ে নবাবের সঙ্গে দেখা করেন। যথাসময়ে নবাব বাহাদুরের দরবারে তাঁকে সসম্মানে নিয়ে যাওয়া হলো। নবাব

পণ্ডিত মানুষ। এত উদার যে তিনি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী সর্বত্র হিন্দুদের প্রধান প্রধান তীর্থস্থান সব দর্শন করে এসেছেন। কাজেই এমন লোকের সঙ্গে স্বামীজী হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান ধর্মের মর্মকথা নিয়ে দুঘণ্টার উপর আলোচনা করে খুব সুখ পেলেন। স্বামীজী দেখালেন সব ধর্মের উদ্ভব মনের গভীরতম প্রদেশে সত্য সাক্ষাৎকারের ফলেই। সবশেষে স্বামীজী তাঁর মনের কথাটিও বলে ফেললেন। তিনি পাশ্চাত্য দেশে সনাতন সর্বজনীন ধর্মপ্রচারে অভিলাষী। নবাব তাঁর বাগ্মিতায় মুগ্ধ। অতএব এ ব্যক্তি যাই প্রচার করুন তাতে যে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি পাবে সন্দেহ নেই। তিনি এক হাজার টাকা তখনই স্বামীজীর পায়ে দিতে উদ্যত হলেন। স্বামীজী তাঁকে নিরস্ত করে বললেন, যখন দরকার হবে তখন তিনি চেয়ে নেবেন।

১৩ ফেব্রুয়ারী সকালে স্বামীজী তাঁর বিদেশ যাওয়ার ইচ্ছা অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের কাছেও প্রকাশ করে এলেন। বিকালে বক্তৃতার বিষয় রাখলেন, 'আমার পাশ্চাত্য গমনের উদ্দেশ্য'। হলে তিলধারণের জায়গা নেই। এক হাজারের ওপর শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছেন দেশ-বিদেশের বহু গণ্যমান্য পণ্ডিত। স্বামীজীর ইংরাজী ভাষায় দখল, পাণ্ডিত্য, শব্দচয়ন, মাধুর্য ও বক্তৃতা দক্ষতায় সবাই আপ্লুত। এঁরা অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে স্বামীজীকে জানিয়ে গেলেন তাঁরা সবাই তাঁর বিদেশ যাত্রায় সাহায্য করবেন। হায়দ্রাবাদে যে বাড়িতে স্বামীজী ছিলেন সেই বাড়ির গৃহকর্তা পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণ করেছিলেন—তাঁর পবিত্রতাভরা সরলতা, সব অবস্থাতে আত্মসংযম ও গভীর অন্তর্মুখীভাব হায়দ্রাবাদবাসীদের মনে চিরজীবনের মতো পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন হয়ে আঁকা ছিল।

আবার মাদ্রাজে ফেরা

হায়দ্রাবাদ থেকে স্বামীজী মাদ্রাজে ফিরে এলেন। সবাই দেখল স্বামীজী নিজের উপর আরো বেশি আস্থাশীল। স্বামীজী বুঝে গিয়েছেন তিনি বিরাট জনসভাতেও শ্রোতাদের মনে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন—যেমন ঘরোয়া বৈঠকে এতদিন দক্ষ ছিলেন। বরং বৃহদাকার সভায় বক্তার অন্তঃশক্তিও বেশি বিকাশ লাভ করে।

তাঁর আশা-উদ্দীপনা ভক্তমহলে আবার সাড়া জাগালো। আবার অর্থসংগ্রহের চেষ্টা শুরু হলো। এই উদ্দেশ্যে মহীশূর, রামনাদ, হায়দ্রাবাদেও লোক গেল। প্রধান উদ্যোক্তা আলাসিঙ্গা পেরুমল দরজায় দরজায় ভিক্ষা করে অর্থ সংগ্রহ করতে শুরু করলেন। তাই এবারের সংগ্রহ মধ্যবিত্ত জনসাধারণের কাছ থেকেই হলো। স্বামীজীও তাই চাইতেন, কেননা তিনি বোধ করতেন যে তিনি ভারতীয় জনতা ও দরিদ্রদেরই জন্য বিদেশ যাচ্ছেন।

আলাসিঙ্গারা এতই তৎপর ছিলেন যে স্বামীজী তাঁদের তৎপরতাকে মায়ের ইঙ্গিত বলে নিশ্চিন্ত হলেন। তবুও গভীরভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদ্দেশে প্রার্থনা করতে থাকলেন যাতে সন্দেহহীন প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের অনুমোদন পান।

একদিন আধোঘুমের অবস্থায় দেখলেন সম্মুখে মহাসাগর। একূল থেকে ওকূলে শ্রীরামকৃষ্ণ হেঁটে চলেছেন। তাঁকেও অনুসরণ করতে হাতছানি দিচ্ছেন। তন্দ্রা ভেঙে গেলে স্বামীজী প্রাণে খুব আনন্দ অনুভব করতে থাকলেন। তখনও তাঁর কানে বাজছে মহাবাণী — "যাও"। তবুও তিনি ভাবলেন, তিনি তো পরিব্রাজক জীবন শুরু করেছেন শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর আশীর্বাদ নিয়ে। এখন ভারতভ্রমণ সেরে সমুদ্রযাত্রা করতে চান। আবার শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ নেওয়া প্রয়োজন। এবং এও ভাবলেন মা যদি অনুমতি দেন তাহলে আর সন্দেহ নয়।

শ্রীশ্রীমা নরেন্দ্রনাথের চিঠি পেয়ে তা হাতে নিয়ে শ্রীঠাকুরের কথা স্মরণ করলেন। শ্রীঠাকুর কত কথাই বলেছেন নরেন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। শ্রীশ্রীমায়ের মনে পড়ল, শ্রীঠাকুর কাগজে লিখে দিয়ে গেছেন, "নরেন্দ্র শিক্ষে দিবে যখন দূরে হাঁক দিবে।" এসব কথা ভেবে মায়ের প্রাণ ভয়ে ভাবনায় ভরে গেলেও, জগতের হিতের জন্যে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ দিয়ে পত্র দিলেন।

মায়ের পত্র পেয়ে স্বামীজী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। যাত্রার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ-প্রায়। এমন সময় হঠাৎ খেতড়ি-রাজের চিঠি এলো এক আনন্দ-সংবাদ নিয়ে। চিঠি নিয়ে এলেন স্বয়ং প্রাইভেট সেক্রেটারী মুন্সী জগমোহন লাল। অপুত্রক খেতড়ি-রাজের পুত্র হয়েছে স্বামীজীর আশীর্বাদে। সেবার খেতড়ি থেকে বিদায় নেওয়ার সময় স্বামীজী খেতড়ি-রাজের ভাবভক্তিতে তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন—পুত্র হবে। তাই হলো যখন, তখন গুরুজীকে নিশ্চয় চাই—পুত্রকে আশীর্বাদ করতে। বিরাট উৎসবের আয়োজন হয়েছে। কিন্তু রাজগুরু উপস্থিত থাকলে তবেই তো উৎসব শুরু হবে।

৩১ মে স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রার দিন ঠিক হয়ে গেছে। পেনিনসুলার এন্ড ওরিয়েন্ট কোম্পানির জাহাজে দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কাটা হবে ঠিক হয়ে গেছে। বোম্বে থেকে ঐদিন জাহাজে উঠবেন। জগমোহনজী জানালেন যে স্বামীজী একদিনের জন্যে হলেও না গেলে রাজা হতাশ হয়ে পড়বেন। স্বামীজীকে নিজ দায়িত্বে অবশ্যই ঠিক সময়ে যাত্রার আয়োজন করে দেবেন। অগত্যা স্বামীজী সম্মত হলেন। খেতড়ি যাওয়ার পথে স্বামীজী বাপিঙ্গানা, বোম্বে ও জয়পুরে নেমেছিলেন। অনেকের মতে এই সময় স্বামীজী আমেরিকা যাওয়ার জাহাজে আলাসিঙ্গাদের দেওয়া টাকায় দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনে রাখেন। বোম্বেতেই আবার স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দজীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তাঁরা পশ্চিমভারত ঘুরে করাচী থেকে জাহাজে চড়ে বোম্বেতে এসেছেন। দু-চার দিন গুরুভাইদের সঙ্গে থেকে স্বামীজী জয়পুরের ট্রেন ধরলেন। গুরুভাইরাও ট্রেনে সঙ্গী হলেন, পথে আবু পাহাড়ে তাঁরা নেমে যাবেন।

স্বামীজী জগমোহন লালের সঙ্গে ১৫ এপ্রিল নাগাদ রেওয়ারী পৌঁছলেন। ২১ এপ্রিল খেতড়ি পৌঁছলেন। ৯ মে পর্যন্ত ওখানে ছিলেন। উৎসবের ধুমধাম শুরু হতে চলেছে। স্বামীজী উৎসব ক্ষেত্রে পৌঁছলে রাজা পায়ে হেঁটে এসে গুরুর পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে ২৫ টাকা প্রণামী রাখলেন।

প্রভু অবগুণ চিত না ধরো, সমদরশী নাম তিহারো

এই উৎসবে নানান আমোদ-আহ্লাদ, ব্রত পালন ইত্যাদির মধ্যে একটি ঘটনা স্বামীজীর হৃদয় জয় করেছিল। তিনি চিন্তার নতুন দিক দেখেছিলেন। এক সন্ধ্যায় এক নর্তকী গানের আসর বসিয়েছে। রাজা আনন্দ সম্ভোগ করছেন। স্বামীজী গানের রসিক ভেবে রাজা তাঁকেও নিয়ে আসতে লোক পাঠালেন। স্বামীজী লোক ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। সন্ন্যাসীর ওসব ক্ষেত্রে থাকা অনুচিত। গায়িকা সেকথা শুনে মনে কষ্ট পেল। ভালো সমঝদারকে গান শোনাতে চায় সে। নর্তকী গান ধরল—হে প্রভু, আমার দোষ তুমি দেখ না। তোমার আর এক নাম সমদরশী। এখন আমাকে তুমি পার কর। লোহা পূজায় লাগে, ঘর বাঁধতে লাগে, লোহা পরশপাথরের স্পর্শে সব দোষ হারিয়ে সোনা হয়ে যায়...

পাশের ঘর থেকে গানটা শুনতে শুনতে স্বামীজীর মনে পড়ল সেই মহামন্ত্রের কথা—সর্ববস্তুর পেছনে এক অভিন্ন ব্রহ্মসত্তা বিরাজ করছে। স্বামীজীর মন ব্রহ্মানুভূতির উচ্চপর্দায় চলে গেল। তিনি ভাবলেন, ভেদজ্ঞান হয় মায়ায়—নির্বেদ অবস্থায় ভেদজ্ঞান থাকে না। তিনি আসরে গিয়ে সকলের সঙ্গে বসলেন।

১০ মে খেতড়ি থেকে বিদায় নিলেন স্বামীজী। মুন্সীজী তাঁর সঙ্গে চললেন। আবার আবুরোড স্টেশনে সেই দুই গুরুভাই-এর সঙ্গে মিলন হলো। সে সময়ে স্বামীজীকে যেমন দেখেছিলেন সেকথা তুরীয়ানন্দজী বলতেন — স্বামীজী অনুভব করতেন বিশ্ববেদনাকে নিজ হৃদয়ে। স্বামীজী বলতেন প্রেমে তাঁর হৃদয় বিরাট হয়ে গেছে। অশ্রুভরা চোখে তীব্র দুঃখবোধের প্রকাশ ভঙ্গিমা দেখে তুরীয়ানন্দজীর বুদ্ধের কথা মনে পড়েছিল। বুদ্ধও কি ঠিক এমনি করে জগৎসংসারের দুঃখ অনুভব করতেন! জগতের দুঃখে স্বামীজীর হৃদয় তোলপাড় করছে। তাঁর হৃদয়টা যে প্রকাণ্ড একটা কড়াই, তাতে জগতের সমস্ত দুঃখকে পাক দিয়ে প্রতিষেধক মলম তৈরি হচ্ছে।

বোম্বের স্টেশনে আলাসিঙ্গা উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজীকে জাহাজে তুলে দিতে মাদ্রাজ থেকে এসেছেন। খেতড়ির মুন্সীজীও রাজ আজ্ঞায় রাজগুরুকে রাজকীয় সম্মানে সাজাতে চান। অতএব স্বামীজীর আপত্তি সত্ত্বেও মুন্সীজী রেশমের পোশাক করিয়ে দিলেন। আলখাল্লা আর পাগড়ী পরালেন তাঁকে। সঙ্গে কিছু অর্থ দিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট যেটা আলাসিঙ্গা কিনে রেখেছিলেন তা বদলে প্রথম শ্রেণীর টিকিট কেটে জাহাজে উঠিয়ে দিলেন। স্বামীজীও জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের দর্শন করতে থাকলেন। তাঁর মন বিষাদ ও আনন্দের মাঝে দোদুল্যমান। বন্ধুদের হৃদয়ও তেমন। তাঁরা বহু কষ্টে এত কিছু সংগ্রহ করে স্বামীজীকে পাঠাচ্ছেন দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস একবার সেদেশে পা দিলেই স্বামীজী সব জয় করে নেবেন।

ছবি : বিজন কর্মকার

শোভাযাত্রা করে ইস্টবেঙ্গল তাদের খেলোয়াড়দের সই করাতে নিয়ে যাচ্ছে।

আই. এফ. এ-র শতবর্ষে ঘরোয়া ফুটবল খেলোয়াড়দের দলবদলের প্রথম দিন মোহনবাগানের শোভাযাত্রা।

মেজাজ খারাপ বিল্টু-মণ্টুর

শা. প্রি. ব

বিল্টু-মণ্টুদের মন-মেজাজ দুই-ই এখন ভীষণ খারাপ। আগস্ট মাস পড়ে গেলো এখনো লীগের খেলাই আরম্ভ হলো না। আরে বাবা, কলকাতার ফুটবল বলতে তো লীগের খেলাই। যদি সেই খেলাটাই না হয় তাহলে কি ভালো লাগে? তার ওপর ফুটবলের কথা বললেই তো সেজদাদু তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠছেন। বলছেন, কলকাতার ফুটবলের কথা আমার সামনে বলবি না। শতবার্ষিকী ফুটবল-টুটবল সব বড় বড় ব্যাপার হচ্ছে—কিন্তু লীগের খেলা কোথায় গেলো?

বিল্টু আর মণ্টু ঘর ছেড়ে পালিয়েছিলো। কী আর বলবে ওরা। জীবনে কোনোদিন শোনেনি জুলাই মাসে দলবদল হচ্ছে। অন্যবার তো এই সময় বড় খেলাগুলোর বেশির ভাগই হয়ে যায়। লীগ চ্যাম্পিয়ন কে হবে তাও প্রায় পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু এবার সব উল্টোপাল্টা ব্যাপার হচ্ছে। তার ওপর এফ. সি. আই.-এর মতো অফিস দলগুলো এবার আবার লীগে খেলবে। তা এফ. সি. আই. দুর্দান্ত দল। কৃশানু দে, বিকাশ পাঁজির মতো কলকাতা ময়দানের অনেক নামকরা খেলোয়াড় ঐ দলের হয়ে এবার লীগে খেলবেন। ব্যাপারটা বিল্টু-মণ্টুরা ঠিক বুঝতে পারে না। এই নিয়ে নণ্টে-ভণ্টেদের সঙ্গে ওদের একদিন ঝগড়াও হয়ে গেছে। এবারের এই ডামাডোল ওদেরও ভালো লাগছে না। তাছাড়া চিবুজার-ক্রিস্টোফারদের নিয়ে যা হলো তাও লজ্জার ব্যাপার। সেজদাদু ঠিকই বলেন, বিদেশী খেলোয়াড়দের কখনো মাথায় তুলতে নেই। তুললেই ওরা ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করবে। তখন ওদের সামলানোই মুশকিল। চিমা কি কাণ্ডই না করেছে। সেজদাদু তাই বিদেশী খেলোয়াড়দের ওপর হাড়েচটা। শুধু প্রশংসা করেন মজিদের। বলেন, সত্যিকারের খেলোয়াড় বলতে যা বোঝায় তা ছিলো ঐ একজনই—মজিদ বাসকার। তা মজিদ তো খুব বেশিদিন খেলতেই পারলো না। গত বছর তো সে দেশে ফিরে গেছে।

বিল্টু-মণ্টুরা তাই এখন ফুটবল ছেড়ে ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা করে। টেনিসের কথা বলে। এবারের উইম্বলডনে স্টেফি গ্রাফের খেলা নিয়ে ওদের কম আলোচনা হয় না। মনিকা সেলেস এবার খেলতে পারেননি। জার্মানির মুক্ত টেনিস প্রতিযোগিতার সময়

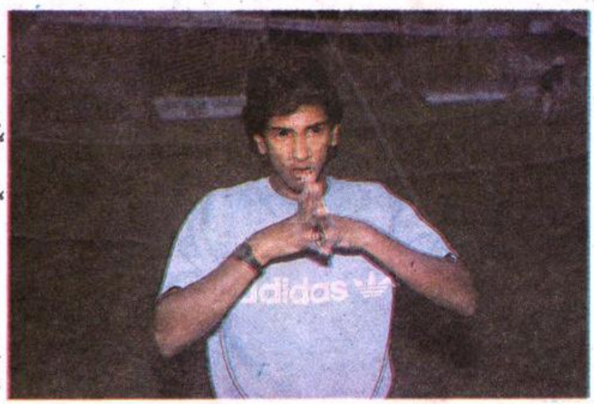

শ্রীলংকার অধিনায়ক অর্জুন রণতুঙ্গে

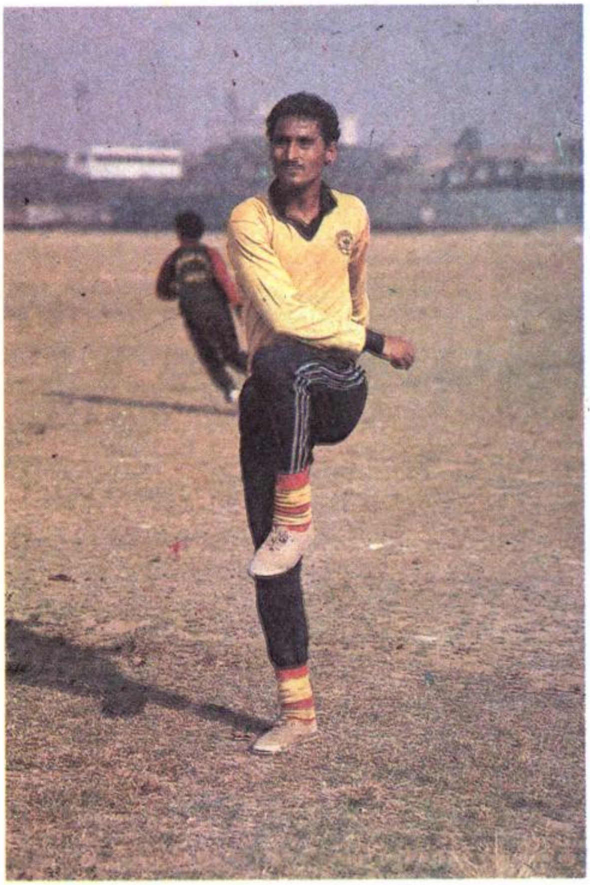

স্বরূপ দাস

স্টেফির এক অন্ধ ভক্ত ছুরি মেরেছিলেন মনিকাকে। সেই শক এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি মনিকা। কবে তিনি আবার কোর্টে ফিরবেন কে জানে। এদিকে স্টেফি ফরাসি মুক্ত টেনিস প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হবার পর উইম্বলডনও জিতেছেন। অবশ্য স্টেফি যে এবার উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হবেন তা সকলেই একরকম নিশ্চিত বলে ধরে নিয়েছিলেন। স্টেফি অবশ্য সেই রকমই খেলছিলেন। কেউ তাঁর সামনে দাঁড়াতেই পারছিলেন না। উইম্বলডনের খেলা কিছুদিন গড়াতেই সকলে ধরে নিলেন এবার মেয়েদের সিঙ্গলস ফাইনাল খেলা হবে স্টেফি গ্রাফের সঙ্গে ৩৬ বছরের মার্টিনা নাভ্রাতিলোভার। কিন্তু সব হিসেব গোলমাল করে দিলেন নভোত্না। কোয়ার্টার ফাইনালে সাবাতিনি আর সেমিফাইনালে মার্টিনা নাভ্রাতিলোভাকে দুর্দান্ত খেলে হারিয়ে দিয়ে তিনি উঠে এলেন ফাইনালে। তাঁর খেলা দেখে পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিলো স্টেফিকে তিনি সহজে ছাড়বেন না। ছাড়েনওনি। উইম্বলডনে এবারের মেয়েদের ফাইনালে দুরন্ত লড়াই হলো। নভোত্না তো প্রায় জিতেই গিয়েছিলেন। স্টেফির অতি বড় সমর্থকও ধরে নিয়েছিলেন পঞ্চমবার উইম্বলডনের রানী হওয়া আর বোধহয় স্টেফির হলো না। কিন্তু হারের মুখে এসে রুখে দাঁড়ালেন স্টেফি। তাঁর অভিজ্ঞতা, অনমনীয় মনোবল নভোত্নার মুঠো থেকে ধীরে ধীরে জয় ছিনিয়ে নিলো। দুর্দান্ত লড়াইয়ের পর স্টেফি গ্রাফ আবার চ্যাম্পিয়ন হলেন।

পুরুষ বিভাগে বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড় পিট সাম্প্রাসের দিকে যে পাল্লা ভারী ছিলো তা সকলেই জানতেন। কিন্তু জিম কুরিয়ার যে তাঁকে চট করে ছেড়ে দেবেন না তাও তো প্রত্যাশিতই ছিলো। তাই মেয়েদের মতো ছেলেদের সিঙ্গলস ফাইনাল খেলাটিও দারুণ জমে উঠেছিলো। খেলার শেষে কুরিয়ার বলেছেন, সাম্প্রাস জিতেছে ওর দুর্দান্ত সেকেন্ড সার্ভিসের জন্যে। ও গত তিন মাস ধরে বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড়। এখন আর কেউ ওর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারবেন না। সাম্প্রাস বলেছেন, উইম্বলডন জেতা যে কী আনন্দের তা কি বলে বোঝানো যায়! আমি জানি, এই জয় এসেছে আমার সার্ভিস রিটার্নের জন্যে। আমার আগে যাঁরা জিতেছেন সেই আগাসি, বেকার, এডবার্গও সার্ভিস রিটার্নে মুন্সিয়ানা দেখাতে পেরেছিলেন বলেই উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন।

আজকাল টেনিস নিয়ে খুব হৈচৈ হচ্ছে। টি. ভি.র দৌলতে কোটি কোটি টাকার মালিক খেলোয়াড়রা এখন ঢুকে পড়েছেন আমাদের অন্দরমহলে। ওঁরা এক একটা প্রতিযোগিতা থেকে

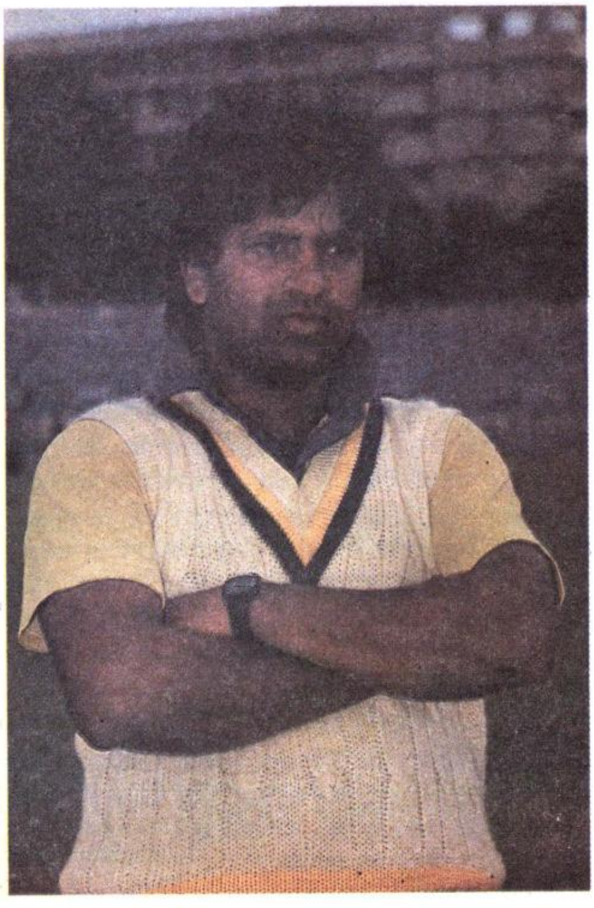

অলংকার রোশন মহানাম্য

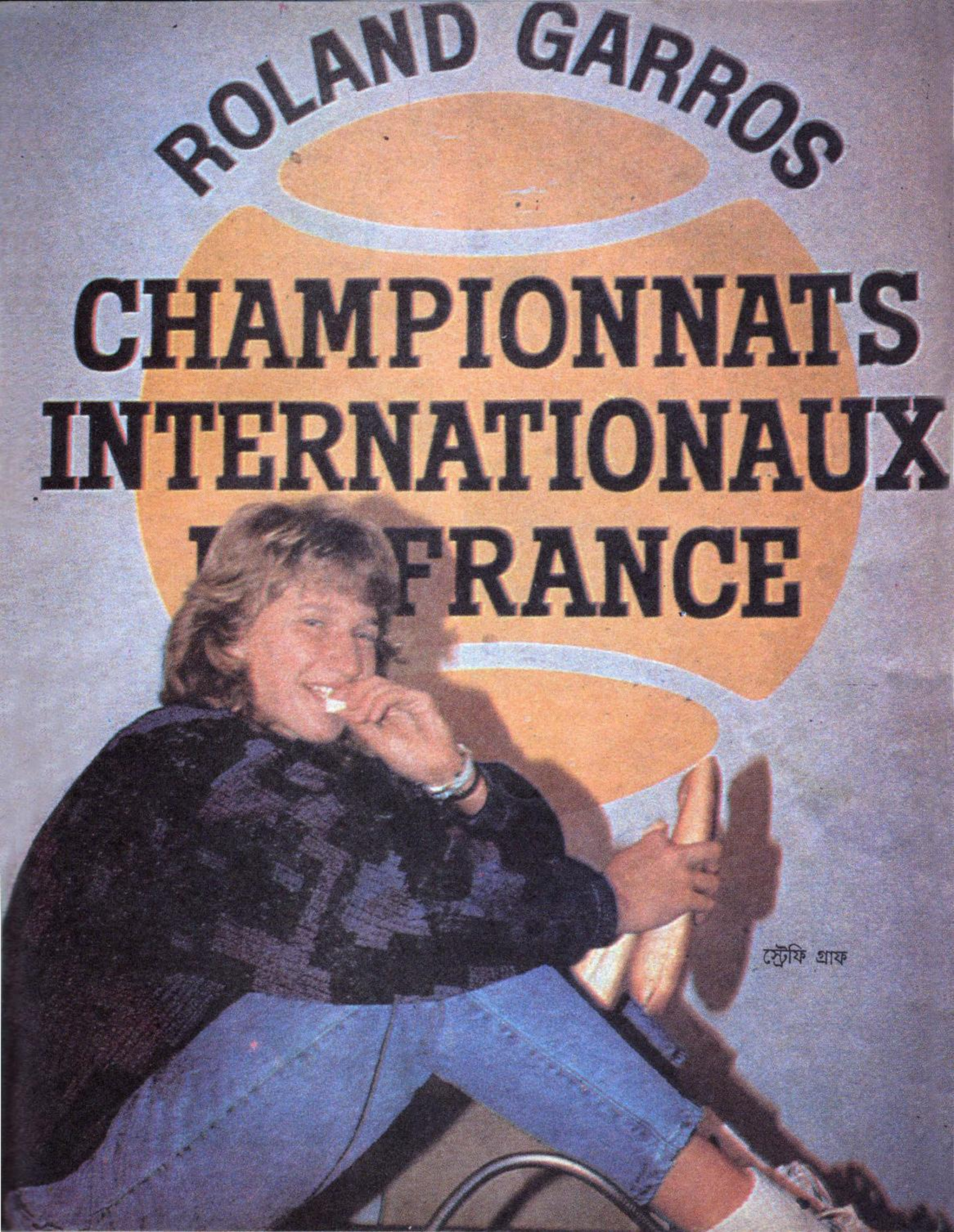

স্টেফি গ্রাফ

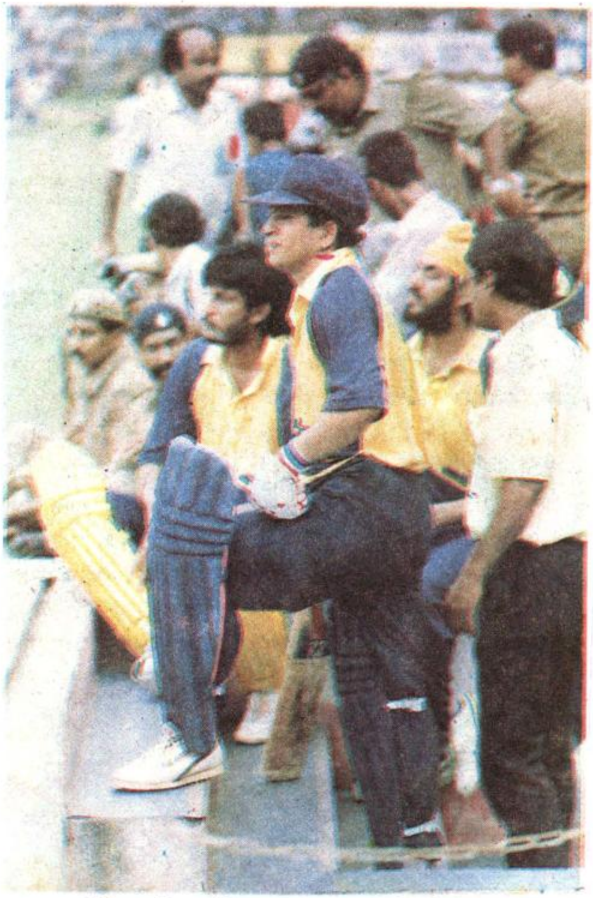

সন্দীপ পাটিল, শচীন তেন্ডুলকার ও মনিন্দর সিং

কতো টাকা পান শুনলে চমকে উঠতে হবে। এবারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন স্টেফি গ্রাফ পেয়েছেন ১৪ কোটির ওপর টাকা। সাম্প্রাস আরো কিছু বেশি। সত্যি ভাবা যায় না।

অবশ্য আমাদের দেশে এখনো অতো টাকার ব্যবস্থা হয়নি। তবে যা হয়েছে তাই বা কম কিসে! সুনীল গাভাসকার, কপিলেদেবরা তো কোটিপতি। অন্যরাও কম যান না। কলকাতার নামকরা ফুটবল খেলোয়াড়রাই বা কম কিসে। তাঁরাও তো একটা মরশুমে খেলার জন্যে মোটা টাকা পান। কোটি না হলেও তাঁরা সকলেই লাখপতি।

থাক ও কথা। ভারতীয় ক্রিকেট দল এখন শ্রীলঙ্কায় খেলছে। টেস্ট আর একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলোর বেশিরভাগই হয়ে গেছে। কপিল যখন শ্রীলঙ্কায় গিয়েছিলেন তখন তিনি নিউজিল্যান্ডের স্যার রিচার্ড হ্যাডলির থেকে মাত্র ১২টি উইকেট দূরে ছিলেন। সেই ব্যবধান পুরোপুরি মুছে দিতে যদি কপিল এখনো না পেরে থাকেন তাহলে যে তিনি অন্তত তার কাছাকাছি পৌঁছেছেন সে বিষয়েও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। শ্রীলঙ্কায় যাবার আগে কপিল অবশ্য বলেছিলেন, আমি চাই এবারই আমার লক্ষ্যে পৌঁছুতে, বিশ্ব রেকর্ড ভেঙে নতুন নজির গড়তে। তবে সেখানেই থেমে থাকতে আমি চাই না। বিশ্বের প্রথম বোলার হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে ৫০০ উইকেট দখল করতে চাই আমি।

গল্প নয় সত্যি

১৯৭১ সালে অজিত ওয়াদেকারের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর ইংলন্ডে গিয়ে পর পর রাবার জিতে দেশে ফিরে আসার পর ভারতীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে খুব একচোট হৈচৈ হলো। প্রায় সব সম্বর্ধনায় হিরো হবার কথা ভারতীয় দলের নবাগত খেলোয়াড় সুনীল মনোহর গাভাসকারের। কিন্তু তা তিনি হতে পারলেন না। কারণ তখন তিনি বারমুডায় ডবল উইকেট ক্রিকেট খেলছেন। ভারতে ফিরে সুনীল দারুণ একটা খবর পেলেন। সেবার দক্ষিণ আফ্রিকার অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবার কথা ছিলো। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বর্ণবৈষম্য নীতির জন্যে সেই সফর বাতিল হয়ে গেছে। তার বদলে বাছাই বিশ্ব দল অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে খেলবে। আর সেই দলে স্থান পেয়েছেন সুনীল গাভাসকার। আনন্দে নেচে উঠলো গাভাসকারের মন। ব্রাডম্যানের দেশে যাবার

নিজেকে ফিট রাখার জন্যে কসরৎ করছেন নবজোৎ সিং সিধু

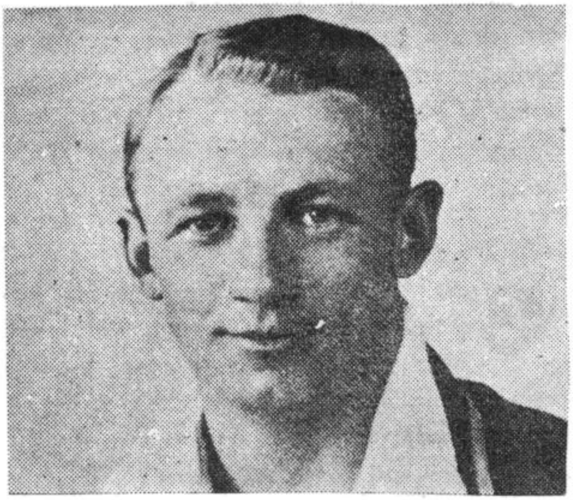

সুযোগ পাওয়া কি কম ভাগ্যের কথা!

সুনীল সিঙ্গাপুর হয়ে অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছেন। ইংলন্ডের খেলোয়াড়রা তখন দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় খেলছিলেন। ওঁরা সেখান থেকে এডিলেডে আসবেন। শুধু টনি গ্রেগ আর হিলটন একারম্যান সোজা উড়ে গেলেন এডিলেডে। বিমানবন্দরে গ্রেগ আর একারম্যানকে রিসিভ করতে এসেছিলেন গ্যারী সোবার্স। তাঁর সঙ্গে ছিলেন একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। ভদ্রলোককে অবশ্য সকলেই চেনেন। তবু বিমানবন্দরে খেলোয়াড়দের সঙ্গে ভদ্রলোকের পরিচয় করিয়ে দিলেন গ্যারি। একারম্যানের ভদ্রলোককে চেনা চেনা মনে হচ্ছিলো। কিন্তু ঠিক চিনতে পারছিলেন না। সোবার্সও ভদ্রলোকের নাম একটু আস্তে বলায় স্পষ্ট শুনতে পাননি। তা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামালেন না একারম্যান।

হোটেলে যাবার আগে একারম্যান তাঁর ব্যাগ-ট্যাগগুলো ভদ্রলোকের কাছে রেখে টয়লেটে ঢুকলেন একটু ফ্রেশ হয়ে আসার জন্যে। মুখটুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে একারম্যান একটু পরেই ফিরে এলেন। ভদ্রলোক তখনো একারম্যানের ব্যাগ-ট্যাগ আগলে দাঁড়িয়ে আছেন। একারম্যান ভাবলেন, ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু কথা না বললে খারাপ দেখায়। হাজার হলেও তাঁরই জন্যে তো ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। তাই জিজ্ঞেস করলেন, অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটের সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক আছে নাকি?

একটু আধটু আছে! ভদ্রলোক আস্তে আস্তে বললেন।

আপনি কখনো ক্রিকেট-ট্রিকেট খেলেছেন?

হ্যাঁ। মাথা নাড়লেন।

ভদ্রলোককে মাথা নাড়তে দেখে একারম্যান একটু অবাক হলেন। উনি তাহলে ক্রিকেটও খেলেছেন! বললেন, আপনার নামটা কি বলুন তো? তখন ঠিক শুনতে পাইনি।

এইবার ভদ্রলোকের চোখে মুখে অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠলো। আস্তে আস্তে বললেন, আমার নাম ডোনাল্ড ব্রাডম্যান......

ফুটবল খেলতে হলে

জর্জ রেনর

(শ্রাবণ সংখ্যার পর)

বুটের বা পায়ের তলা দিয়ে বল নিখুঁতভাবে ট্র্যাপ করতে হলে বলটি ঠিক কোথায় লাফাবে সেই সম্বন্ধে খেলোয়াড়দের স্পষ্ট ধারণা ও জ্ঞান থাকা দরকার। ডান পা দিয়ে বল ট্র্যাপ করার সময় বাঁ পাটি থাকবে যেখানে বলটি মাটিতে পড়বে তার সামান্য বাঁ দিকে। এ সময় ডান পা এমন ভাবে উঁচু করতে হবে যাতে 'থাই' শরীরের সঙ্গে ৯০ ডিগ্রি কোণ করে থাকে। যে মুহূর্তে বলটি মাটিতে পড়বে তখনই ডান পায়ের পাতা বলের দু-তিন ইঞ্চি ওপরে রাখতে হবে। বলটি যে দিকে মারতে চাও পায়ের পাতা সেইদিকে যতোটা সম্ভব সমকোণ করে থাকবে। ছবিটা ভালো করে দেখো তাহলেই বুঝতে পারবে। আর ঐ যে দু-তিন ইঞ্চি বা সমকোণ কিম্বা ৯০ ডিগ্রি-টিগ্রির কথা বললাম ও সব নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাবে না। ও আপনা-আপনিই হয়ে যাবে।

পায়ের মধ্যভাগ দিয়ে ট্র্যাপ করে বল নিজের আয়ত্তে আনা একটি সাধারণ পদ্ধতি। তবে এই ব্যাপারে দরকার নিখুঁত সময়জ্ঞান। ঠিক কোন জায়গায় বলটি মাটিতে পড়বে তা ঠিক ঠিকভাবে বুঝে নিয়ে বলের দিকে মুখ করে সেই দিকে এগিয়ে যেতে

হবে। ডান পা দিয়ে ট্র্যাপ করতে হলে অপর পা বলটি যেখানে পড়বে তার পাশেই রাখতে হবে। শরীর সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে থাকবে আর বাঁ কাঁধ যাবে এগিয়ে। বলটা মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনেকটা ঝাঁট দেবার ভঙ্গিতে ডান পায়ের মধ্যভাগটি নামিয়ে আনতে হবে বলের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে। পুরো ব্যাপারটা মাথায় রেখে কিছুদিন প্র্যাকটিশ করলেই দেখবে দিব্যি সড়গড় হয়ে উঠেছো। আর যদি দেখিয়ে দেবার মতো কেউ থাকেন তাহলে তো কথাই নেই।

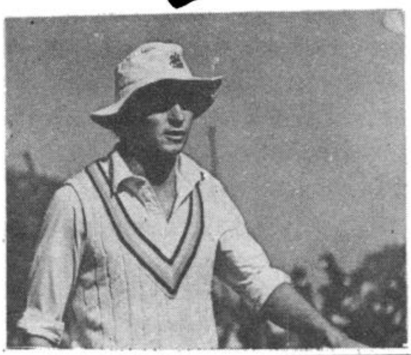

খেলার খবর-টবর

এবার গাওয়ার

ইমরানের পর এবার ডেভিড গাওয়ার ক্যানসার রোগীদের সাহায্যের জন্যে পথে নেমেছেন। ইমরান তাঁর মায়ের নামে করাচিতে হাসপাতাল তৈরি করছেন। ইমরানের মা ক্যানসারে মারা গিয়েছিলেন। তখন থেকেই ইমরানের ইচ্ছে একটি আধুনিক ক্যানসার হাসপাতাল তৈরি করার। তা ইমরানের হাসপাতালের কাজ এখন অনেক এগিয়ে গেছে। ওদিকে ম্যাকমিলান নার্স ক্যানসার আপিলের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করতে পথে নেমেছেন গাওয়ার। গাওয়ারের এই অর্থ সংগ্রহ অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে ম্যাকমিলান মাইল চ্যালেঞ্জ। এইজন্যে গাওয়ার খুব পরিশ্রম করছেন। এই ব্যাপারে ইয়ান বথামকে অবশ্য কেউ টেক্কা দিতে পারবেন না। বথাম তাঁর লিউকোমিয়া হাসপাতাল আর রিসার্চ সেন্টারের জন্যে হাজার হাজার মাইল হেঁটে অর্থ সংগ্রহ করেছেন। পৃথিবীর হেন দেশ নেই টাকা তোলার জন্যে বথাম যেখানে যাননি। তা বথামের স্বপ্ন সফল হয়েছে। ছোটদের লিউকোমিয়া রিসার্চ সেন্টার আর হাসপাতাল এখন দিব্যি চলছে। বথাম, ইমরান, গাওয়াররা যা করছেন আমরা কেন তা করতে পারি না?

রিচির বাজনা

ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক রিচি রিচার্ডসন গিটার বাজাতে খুব ভালোবাসেন। বাজানও দিব্যি। কোথাও খেলতে গেলে গিটার তাঁর সঙ্গে যাবেই। ৩১ বছরের রিচার্ড বেঞ্জামিন রিচার্ডসন এই মুহূর্তে বর্তমান বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যান। কমপিউটার র‍্যাঙ্কিং তো সেই কথাই বলছে। ১৯৮৩ সালে ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলা শুরু করেন রিচি রিচার্ডসন। প্রথম ইনিংসে শূন্য দিয়ে তাঁর টেস্ট জীবন শুরু। এ পর্যন্ত তিনি সত্তরটির মতো টেস্ট খেলেছেন। করেছেন পাঁচ হাজারের ওপর রান। সেঞ্চুরি করেছেন ১৫ বার। ভিভ রিচার্ডসের অন্ধ ভক্ত তিনি। তাঁর আদর্শ খেলোয়াড় হলেন স্যার গ্যারি সোবার্স আর অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক গ্রেগ চ্যাপেল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক হিসেবেও রিচার্ডসন ইতিমধ্যেই দারুণ সাফল্য লাভ করেছেন। অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, পাকিস্তানকে হারিয়ে দিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে আবার জয়ের পথে টেনে এনেছেন। ভিভ রিচার্ডস ছিলেন অ্যান্টিগুয়ার খেলোয়াড়। রিচি রিচার্ডসনও তাই। ওয়েস্ট ইন্ডিজের নেতৃত্ব তাই এখন দীর্ঘদিন ধরে অ্যান্টিগুয়ার খেলোয়াড়দেরই হাতে আছে। রিচার্ডসন ক্যারিবিয়ান দলকে আর কতোটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন সেইটাই এখন দেখার বিষয়।

উক্তি

আমাদের দেশে বর্ণবিদ্বেষীদের বড্ড ভিড়। আমি তার বিরোধী। তাই আন্দোলন করছি। সত্যি, এ যুগে গায়ের রং নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনো মানে হয়?

(নিজের কথা বলতে গিয়ে) —বরিস বেকার

সত্যি এমন একটা কাণ্ড যে কোনোদিন হবে তা আমি ভাবতেই পারিনি, তাও আবার আমাদের দেশে, আমারই ফ্যানের দ্বারা। লজ্জায়, ঘেন্নায় আমার মরমে মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

(মনিকা সেলেস কোর্টে ছুরিবিদ্ধ হবার পর) —স্টেফি গ্রাফ

জুলাই মাস পড়ে গেলো, এখনো লীগের খেলা শুরু হলো না। সত্যি ভাবাই যায় না এ কথা। প্রদ্যোৎদাই কলকাতার ফুটবলের বারোটা বাজিয়ে দিলেন।

(সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে) —গৌতম সরকার

আমি গোল পাচ্ছি না, মারাদোনা খেলতে পারছে না, গুলিট খেলা ছেড়ে দেবো, ছেড়ে দেবো করছে—সত্যি কি যে হচ্ছে ফুটবল জগতে!

(জাপানে একটি পত্রিকার এক সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে)

—গ্যারি লিনেকার

তোমাদের জিজ্ঞাসা

কৌশিক আশ (c/o ডঃ এ. সি. আশ, ত্রিরকুণ্ডা, ধানবাদ, বিহার)

প্রশ্ন: বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান ও অলরাউন্ডার কে?

উত্তর: ওয়েস্ট ইন্ডিজের রিচি রিচার্ডসন ও ভারতের কপিলদেব।

ঝুমা রায় (যোধপুর পার্ক, কলকাতা)

প্রশ্ন: সঞ্জয় মঞ্জরেকার ও শচীন তেণ্ডুলকারকে ব্যক্তিগত ভাবে চিঠি লিখতে হলে কোন ঠিকানায় লিখবো?

উত্তর: দুজনকেই c/o বোম্বাই ক্রিকেট সংস্থা, ওয়াংখাড়ে স্টেডিয়াম, বোম্বাই—এই ঠিকানায় চিঠি লেখা যেতে পারে।

অজন্তা (তমলুক, মেদিনীপুর)

প্রশ্ন: স্নেহাশিস গাঙ্গুলিকে কোন ঠিকানায় চিঠি লিখবো?

উত্তর: পুরো নাম লেখোনি কেন? স্নেহাশিস গাঙ্গুলি c/o সি. এ. বি. ক্লাব হাউস, ইডেন উদ্যান, কলকাতা-১

হীরক চৌধুরী (রাধানগর, ঘূর্ণী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া)

প্রশ্ন: বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ বোলার কে?

উত্তর: ভারতের অধিনায়ক আজহারউদ্দিনের মতে অনিল কুম্বলে।

তাপস মুখার্জি ও সত্যবান মণ্ডল (সাগরপাড়া হাইস্কুল, মুর্শিদাবাদ)

প্রশ্ন: ভারতের কোন উইকেটরক্ষক টেস্ট ক্রিকেটে একশ জনেরও বেশি ব্যাটসম্যানকে আউট করেছেন।

উত্তর: সৈয়দ কিরমানি ৪৮টি টেস্টে ১৩৪ জনকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

স্পোর্টস কুইজ

প্রশ্ন:

১) কোন ভারতীয় খেলোয়াড় চারবার উইম্বলডনের প্রাক কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত উঠলেও আর এগোতে পারেননি একবারও?

২) ১৯৬২ সালের এশিয় ক্রীড়ার ফুটবল ফাইনালে ভারতের জয়সূচক গোলটি কে করেছিলেন?

৩) ওয়েস্ট ইন্ডিজের জোয়েল গারনার ছ ফুট সাড়ে সাত ইঞ্চি লম্বা। সেই অনুপাতে ওঁর পা-ও বড়। ওঁর জুতোর মাপ কতো?

৪) টেনিস খেলোয়াড় বিজয় অমৃতরাজ এবং ওলিম্পিক ভারোত্তোলক হ্যারল্ড সাকাতার মধ্যে একটা বিষয়ে মিল আছে। সেটা কি?

৫) পোলো খেলার সময় ভারতের এক সুলতান ও একজন নবাব মারা গিয়েছিলেন। তাঁদের নাম কি?

৬) উইম্বলডনে মহিলা বিভাগের ফাইনালিস্ট নভোত্না বাছাই তালিকায় কতো নম্বরে ছিলেন?

৭) টানা দশ বছর ভার্জিনিয়া স্লিমস টেনিস প্রতিযোগিতায় খেলা সত্ত্বেও কে জানতেন না যে ঐ প্রতিযোগিতাটি একটি সিগারেট কোম্পানির নামে হয়?

৮) একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম কোন বোলার পাঁচটি উইকেট দখল করেন?

৯) পরবর্তী বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার দুটি বিভাগে কটি করে দল আছে? দেশগুলির নাম কি?

১০) স্টেফি গ্রাফ ও পিট সাম্প্রাস উইম্বলডনের বাছাই তালিকায় কতো নম্বরে ছিলেন?

উত্তর:

১) জয়দীপ মুখার্জি

২) জার্নাল সিং

৩) ১৬ নম্বর

৪) দুজনেই জেমস বন্ডের সিনেমায় অভিনয় করেছেন। বিজয় করেছেন অক্টোপুসিতে আর সাকাতা অভিনয় করেছেন গোল্ডফিঙ্গারে।

৫) কুতুবউদ্দিন আইবেক ও পাতৌদির নবাব ইফতিকার আলিখান

৬) ৮ নম্বর

৭) পাম সিভার

৮) ডেনিস লিলি

৯) ছটি করে। ক বিভাগে আছে—পাকিস্তান, ইংলন্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড এবং দুটি যোগ্যতা অর্জনকারী দেশ।

খ বিভাগে আছে—ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবুয়ে এবং একটি যোগ্যতা অর্জনকারী দেশ।

১০) দুজনেই ছিলেন শীর্ষ বাছাই।

সেলটিকঃ কেনী ড্যাগ্লিশের ক্লাব

সুমন ভট্টাচার্য

ইংলন্ডের ফুটবল নিয়ে সারা বিশ্ব জুড়ে আলোচনা করা হয়। ইংলন্ডকে ফুটবলের জন্মস্থানও বলা হয়। কিন্তু ইংলন্ডের পাশেই যে দেশ সেই স্কটল্যান্ডের ফুটবল নিয়ে কেউ কিছু বলে না। অথচ স্কটল্যান্ডের ফুটবলও বিশ্ববিখ্যাত। স্কটল্যান্ডও উপহার দিয়েছে বহু বিশ্বখ্যাত ফুটবল তারকাকে।

স্কটল্যান্ডের সবচেয়ে বিখ্যাত ক্লাবটি হলো সেলটিক। শতবর্ষের ওপর পুরনো ইতিহাস সেলটিকের। সেই ১৮৮৮ সালে ক্লাবটির জন্ম। গ্লাসগোর নাম মূলতঃ ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের জন্য বিখ্যাত হলেও সেলটিকের দৌলতে স্থানটির নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। শিল্পশহর গ্লাসগোর অর্থে ও শিল্প শ্রমিকদের উৎসাহে সেলটিক পৌঁছে যায় জনপ্রিয়তার শিখরে। বলা যেতে পারে সেলটিকের সূচনা 'সোনার চামচ মুখে দিয়ে'। কারণ প্রথম খেলাতেই তারা তাদের পরবর্তীকালের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্লাসগো রেঞ্জার্স-কে হারিয়ে দিয়েছিল ৫-২ গোলে। পরেও কোনোদিন সেলটিক গ্লাসগো রেঞ্জার্সকে তার সঙ্গে এঁটে উঠতে দেয়নি। ক্লাবটি ৩১ বারের বেশি স্কটিশ লীগ ও ২৬ বারের বেশি স্কটিশ কাপ জিতেছে। স্কটল্যান্ডের অপ্রতিদ্বন্দ্বী দল হিসারে তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে।

১৯৬৭তে প্রথম স্কটিশ দল হিসাবে তারা লিসবনে ইতালির ইন্টারন্যাশনালকে ২-১ গোলে হারিয়ে ইউরোপীয়ান কাপ জিতে নেয়। ৩ বছর বাদে অবশ্য ভাগ্যদেবী তাদের উপর বিরূপ হন, ইউরোপীয়ান কাপের ফাইনালে উঠেও তারা হেরে যায়। মিলানে অনুষ্ঠিত ফাইনালে দুরন্ত লড়াইয়ের পর তারা হল্যান্ডের ফেয়ানর্ডের কাছে অতিরিক্ত সময়ে হেরে যায় ১-২ গোলে।

১৯৬৭-তে বিশ্বক্লাব কাপে খেললেও তারা আর্জেন্টিনার রেসিং ক্লাবের কাছে হেরে যায় দীর্ঘ তিনটি লড়াইয়ের পর (১-০, ২-১, ১-০)। এই সময় ক্লাবের অন্যতম বিখ্যাত খেলোয়াড় ছিলেন লেনক্স। তিনি ১৯৬৮ সালে ইউরোপের তৃতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পান। সেই মরশুমে তিনি ৩২টি গোল করেছিলেন।

সেলটিকের খেলার মূল আকর্ষণ তাদের আক্রমণের প্রবণতা ও গতিশীলতা। সেলটিক সনাতন ব্রিটিশ রীতির পরিবর্তে ব্যক্তিগত দক্ষতা প্রদর্শন ও দলগত খেলার মান উন্নয়ন দুটোর উপরই জোর দিয়েছে। সেলটিকের বিখ্যাত ম্যানেজারদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য জ্যাক স্টেইনের নাম। তিনি ১৯৫৫ থেকে ১৯৭৪-এর মধ্যে ক্লাবকে অপ্রতিরোধ্য করে তোলেন।

শুধুমাত্র ম্যানেজারই নন, সেলটিকের সাফল্যের মূলে আছে বহু বিখ্যাত খেলোয়াড়েরও অবদান। এঁদের মধ্যে সর্বাধিক বিখ্যাত জিমি ম্যাকগ্রয়। তিনি এক আধ বছর নয়, ক্লাবের হয়ে টানা ১৬টি বছর খেলেছিলেন। গোল ক্ষুধার্ত ম্যাকগ্রয় গড়ে দলের হয়ে প্রতিটি ম্যাচে গোল করেছিলেন। দলের অন্যান্য বিখ্যাত খেলোয়াড়দের মধ্যে আছেন বিবি ম্যাকনিল, ববি মার্ডক, টমি গেমেল, বার্ট ওল্ড, চার্লি টুলি, জন হিউজেস, জিমি জনস্টোন, ডেভি হে, লা মাকারি, ড্যানি ম্যাকগ্রেইন, জর্জ কনোলী, কেনী ড্যাগ্লিশের মতো খেলোয়াড়রা।

সাম্প্রতিক কালে ক্লাবের ইতিহাসে সবচেয়ে স্মরণীয় মরশুম ১৯৮৭-৮৮। ঐ বছর তারা একই সঙ্গে লীগ ও কাপ জিতে দশম বার দ্বিমুকুট অর্জনের বিরল কৃতিত্ব দেখায়। সেলটিক তাই শুধু স্কটল্যান্ডের নয়, ইউরোপীয় ফুটবলের অন্যতম শক্তি।

প্রসন্নর স্বপ্ন

স্পিন বোলিংএ ভারত একসময় ছিলো বিশ্বের সেরা। কিন্তু প্রসন্ন, বেদী, চন্দ্রশেখর আর বেঙ্কটরাঘবনের পর ঠিক সেই রকম সত্যিকারের ভালো স্পিনার আর পাওয়া গেলো না। অনিল কুম্বলে বেঙ্কটপতি রাজুরা যে ওঁদের তুলনায় কিছুই নন সে কথা বোধহয় না বললেও চলে। এমন কেন হবে? এর থেকে পরিত্রাণ পাবার কি কোনো উপায় নেই? প্রসন্নর মতে—নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু শুধু এই কথা বলে চুপ করে বসে থাকেননি এরাপল্লি প্রসন্ন। তিনি নিজে এবার ছোট ছোট ছেলেদের স্পিন বোলিং শেখানোর জন্যে এগিয়ে এসেছেন। প্রসন্ন বাঙ্গালোরে ইতিমধ্যেই একটি স্পিন বোলিং ক্লিনিক খুলেছেন। আট থেকে বারো বছরের একশ জন খেলোয়াড় প্রসন্নর কাছে তালিম নিচ্ছে। প্রসন্নর মতে এদের মধ্যে বেশ কয়েকজনেরই উঠে আসার সম্ভাবনা আছে। প্রসন্ন কিন্তু শুধু ক্লিনিক খুলেই চুপ করে যেতে চান না। তিনি চান স্পিন একাডেমি চালু করতে। আর তা আসছে বছরেই। প্রসন্ন বলেছেন, এই স্পিন একাডেমির দায়িত্ব নেবার জন্যে আমার তিন বন্ধু, বিষেণ সিং বেদী, ভাগবৎ চন্দ্রশেখর আর এস. বেঙ্কটরাঘবনকে দরকার সব থেকে বেশি। ওদের হাতেই নিশ্চিন্তে ছেড়ে দেওয়া যাবে খুদে খেলোয়াড়দের।

প্রসন্নর দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর চেষ্টা সফল হবেই। আর এখানে শুধু ভারত নয় বিদেশ থেকেও খেলোয়াড়রা স্পিন বোলিং শিখতে আসবে। একাডেমি একটু বড় হলেই তিনি পাকিস্তান থেকে আব্দুল কাদিরকে নিয়ে আসবেন ছোটদের স্পিন বোলিং-এর কায়দা শেখাবার জন্যে। প্রসন্নর স্পিন ক্লিনিক এখন চলছে বাঙ্গালোরের আম্বেদকার কলেজের প্রাঙ্গনে। কিন্তু স্পিন একাডেমির জন্যে আলাদা জায়গা চাই। বাড়ি চাই। চাই আরো অনেক কিছু। সেইজন্যই প্রসন্ন এখন চেষ্টা চালাচ্ছেন। তবে তাঁর বিশ্বাস আগামী বছরই তিনি স্পিন একাডেমির কাজ শুরু করে দিতে পারবেন। এর জন্যে স্পনসররাও নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবেন। দেখা যাক প্রসন্নর স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত সফল হয় কিনা!

পড়ার সঙ্গে খেলা

সর্বাণী মুখোপাধ্যায়

মদারাট ঈশানচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়

আজ থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে রাজ্যসরকার গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাদানের পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনার ঢেউ পশ্চিম বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে। সর্বত্রই কিছু বিদ্যানুরাগী মানুষের নিরলস প্রচেষ্টায় প্রচুর বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। এইরকম ভাবে গড়ে ওঠা একটি স্কুলের কথা আজ তোমাদের শোনাবো।

১৯৬৩ সালে মদারাট অঞ্চল বালিকাবিদ্যালয়ের শুভ সূচনা হয়। পরে এটি ঈশানচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয় বলে পরিচিতি লাভ করে। স্কুলটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় বারুইপুর থানার অন্তর্গত মদারাট গ্রামে অবস্থিত। এই গ্রামের ৺শ্রী নিত্যানন্দ পাল তাঁর পিতা ৺ঈশানচন্দ্রের নামে জমি ও অর্থদান করলে তাঁর নামানুসারে স্কুলের নামকরণ করা হয়।

স্কুলটির নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রধান শিক্ষিকা মনীষা দাশগুপ্তা বললেন, 'এই স্কুলের অধিকাংশ ছাত্রীই এমন সব পরিবার থেকে আসে যে পরিবারে তারাই প্রথম প্রথাগত শিক্ষার মধ্যে আসছে।'

আরেকজন শিক্ষিকার সঙ্গে আলাপ হলো, তিনি জানালেন যে বর্তমানে ছাত্রীসংখ্যা প্রায় সাতশো। তবে বেশিরভাগই নিম্নবিত্ত তফশিলি জাতি/উপজাতি, মুসলমান, খ্রীস্টান ও বর্ণহিন্দু পরিবারের। ছাত্রীদের লেখাপড়ায় আগ্রহী ও আর্থিক সাহায্য করার জন্য স্কুলে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত কতগুলি বৃত্তি ও পুরস্কার চালু রয়েছে।

স্কুলটির একটি নিজস্ব পাঠাগার আছে। মাধ্যমিকে পাশের হার সামগ্রিকভাবে ভালো। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করা ছাত্রীর সংখ্যা কম, কেন না বেশির ভাগ ছাত্রীরই বাড়িতে পড়ার পরিবেশ নেই। সেই সঙ্গে বইপত্র কেনার ও টিউশান ফি দেবার মতো সামর্থ্যও নেই। তবু এর মধ্যে থেকেই পড়াশোনা করে অনেক ছাত্রী প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। যেমন সাধনা বাগ মেয়েটি ক্ষেত মজুর পরিবার থেকে এসেছেন। তিনি এখন পলিটেকনিক পাশ করে ফিলিপসে কাজ করছেন। রমা মুখার্জী নার্সিং ট্রেনিং নিয়ে সরকারি হাসপাতালে কর্মরত।

স্কুলের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো প্রায় পনেরো বছর ধরে বহু কৃতি এ্যাথলিট এই স্কুলে পড়াশোনা করেছেন ও স্কুলের

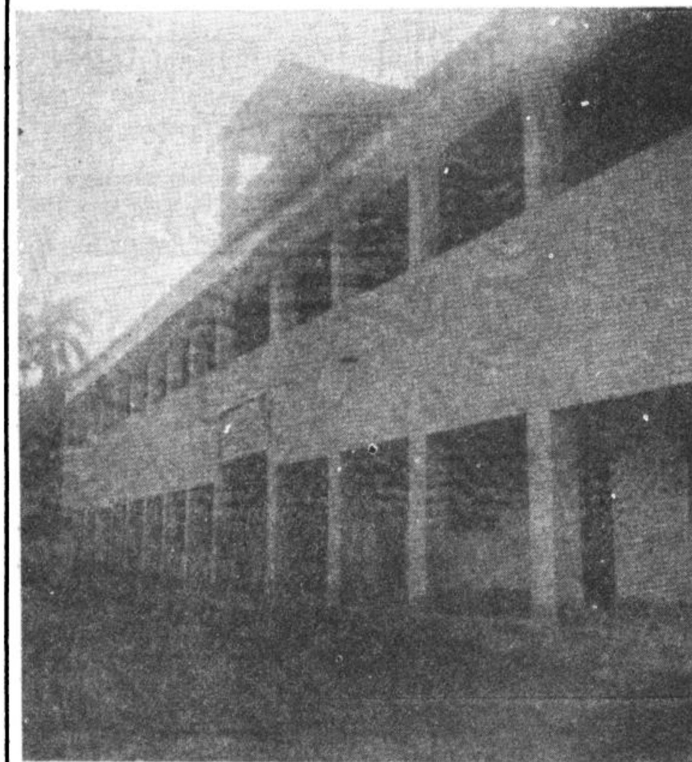

পরিচিতিকে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছেন। স্কুলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খেলার শিক্ষিকা আছেন। স্কুলটির নিজস্ব মাঠে হকি, বাস্কেটবল, কাবাডি, খো-খো, হাইজাম্প, লংজাম্প ইত্যাদির অনুশীলন করানো হয়। হকিতে স্কুলটি দুবার জেলা চাম্পিয়ান হয়। এ্যাথলেটিকসে দুবার ইনসেনটিভ প্রাইজ মানি হিসাবে দশ হাজার টাকা পেয়েছে। বিভিন্ন ইভেন্টে খেলে যাঁরা নেতাজী সুভাষ জাতীয় বৃত্তি পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন সুবী নন্দী, পূর্ণিমা দাস, মিতা মুখার্জী, স্বপ্না মুখার্জী, মহামায়া দাস, মল্লিকা দাস, সীমা নাগ, ঝর্ণা দাস প্রমুখ।

স্কুলের দুই প্রাক্তন ছাত্রী মিনতি দাস ও কিঙ্করী দাসের সঙ্গে আলাপ হলো। এঁরা পূর্বরেল-দপ্তরে কাজ করেন। বহুবার জাতীয় স্তরে খেলেছেন ও পজিশান পেয়েছেন। পূর্ণিমা দাস '৭৯-'৮০ সালে টোকিওতে এশিয়ান ট্রাক এন্ড ফিল্ড ইভেন্টের জন্য নির্বাচিত হন। স্কুলে এখনো অনেক সম্ভাবনাপূর্ণ ছাত্রী আছে যারা উপযুক্ত কোচিং ও আর্থিক সাহায্য পেলে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করতে পারবে।

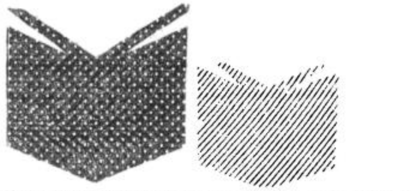

আপনি কি হারাচ্ছেন জানেন কি ?

গ্রাহকদের জন্যে

বিশেষ সুযোগ

এক বছরের

পুজো সংখ্যা সহ ১২টি সংখ্যা হাতে নিলে ১২২ টাকার বদলে মাত্র ৯০ টাকা। বুক পোস্টে ১১০ টাকা। রেজিঃ পোস্টে ১৭০ টাকা।

দু বছরের

দুটি পুজো সংখ্যা সহ ২৪টি সংখ্যা হাতে নিলে ২৪৪ টাকার বদলে মাত্র ১৭০ টাকা। বুক পোস্টে ২১০ টাকা। রেজিঃ পোস্টে ৩৩০ টাকা।

তিন বছরের

তিনটি পুজো সংখ্যা সহ ৩৬টি সংখ্যা হাতে নিলে ৩৬৬ টাকার বদলে মাত্র ২৫০ টাকা। বুক পোস্টে ৩১০ টাকা। রেজিঃ পোস্টে ৪৯০ টাকা।

গ্রাহকদের জন্যে এই বিশেষ সুযোগ নিতে হলে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা পরিষ্কার করে লিখে নিচের ঠিকানায় এম. ও. করুন। চেক ও ড্রাফটেও টাকা পাঠাতে পারেন। বাংলার বাইরের ব্যাঙ্কের চেক হলে ২০ টাকা বেশি লাগবে। 'শুকতারার জন্য' কথাটি পরিষ্কার করে লিখে দেবেন।

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ
২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম / তুষার শীল

তোলাঙ্গুলাসন

শিশু অবস্থা থেকে একদিন না একদিন বার্ধক্যে উপনীত হতেই হবে। এটাই হলো জীবনের ধর্ম। কিন্তু শৈশব ও বার্ধক্যের মাঝে আসে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবন, যৌবন থেকে উত্তর-যৌবন, তারপরে বার্ধক্য। শৈশব ও কৈশোর আপনা আপনিই পার হয়ে যাবে। কিন্তু যৌবনকে দীর্ঘ দিন ধরে রাখা যায় যদি আমাদের মধ্যে একটু সচেতনতা, একটু সংযম থাকে। এই সচেতনতা ও সংযম বলতে বোঝাচ্ছি নিয়মিত শরীরচর্চা আর চারপাশের নানারকম লোভনীয় খাদ্য যা আমাদের শরীর ধ্বংস করে, সে সব থেকে দূরে সরে থাকা। যৌবন দিয়েই আমরা বার্ধক্যকে ক্রমাগত দূরে ঠেলে নিয়ে যেতে পারি।

আজকের আসনটির নাম তোলাঙ্গুলাসন। তুলাদণ্ড থেকে এই আসনটির নাম এসেছে।

প্রথমে পদ্মাসনে বসো। ডান জানুর উপর বাঁ পা ও বাঁ জানুর উপর ডান পা তুলে বসাই হলো পদ্মাসন। এখন ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ে শরীরের ভঙ্গিমাটি নিয়ে এসো ছবির মেয়েটির মতো। এই অবস্থানে শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে ২০/২৫ সেকেন্ড থাকো। তারপর পা খুলে দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে বিশ্রাম নাও। মনে আছে নিশ্চয়ই, কি করে বিশ্রাম নিতে হবে ? তবুও সংক্ষেপে বলে দিই। শরীরটাকে শিথিল করে দাও, দু পায়ের মাঝে ৮/১০ ইঞ্চি ফাঁক রাখবে। চোখ বন্ধ করে দিয়ে চিন্তা করবে শরীরের উন্নতির কথা। এই ভাবে ২/৩ মাত্রায় অভ্যাস কর। প্রতি মাত্রার পর পা অদলবদল করে নিও।

এই আসনটি নিয়মিত অভ্যাস করলে পেটের অতিরিক্ত মেদ দূর হয়ে যাবে, অম্বল, অজীর্ণ, আমাশয় প্রভৃতি রোগ থেকে অব্যাহতি পাবে, শরীরের ভারসাম্য বাড়ে, বহুমূত্র রোগে যাঁরা ভুগছেন তাঁরাও উপকার পাবেন। ঘাড়ে, কোমরে ব্যথা থাকলে এই আসনটি করার আগে একটু বিশেষজ্ঞের মতামত নিয়ে নিও। যাদের সে সুযোগ নেই তারা এখন আসনটি করবে না।

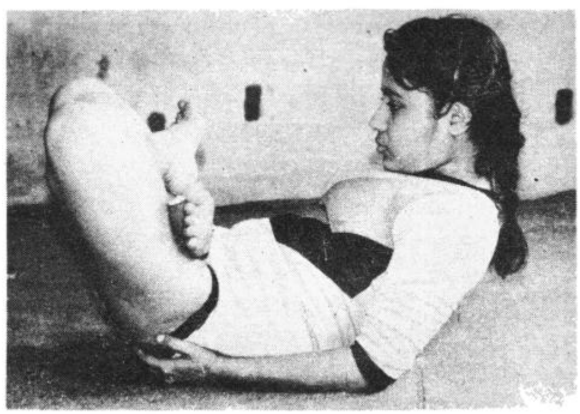

চন্দ্রানদীর পাড়ে

কিরণশঙ্কর মৈত্র

দেবভূমি হিমাচলের সবচেয়ে উঁচু জেলা লাহুলস্পিতি তেরো থেকে কুড়ি হাজার ফুট উঁচুতে। চন্দ্রানদীর উপরে যে সমতলভূমি সেখানেই লাহুল উপত্যকা।

অনেক দিন আগের কথা। লাহুল উপত্যকায় ছিল একটা ছোট্ট গ্রাম, নাম তার শিশু গ্রাম। সারা বছর ভারী বরফের পোশাক পরে থাকার পরে জুন মাসে শিশু গ্রামে দেখা যায় সবুজ রঙের আবরণ।

সে বছর জুন মাসেও হঠাৎ ভারী বরফপাত হলো শিশুতে। ডিসেম্বরের মতো সারা জায়গায় শুধু বরফ আর বরফ। গ্রামবাসীদের মন খুব খারাপ। যে সব ছোট বার্লিগাছ মাথা তুলেছিল সব মারা গেল। দেখা দিল খাবারের অভাব। বৌদ্ধ লামারা এসে 'তন মন' মন্ত্র পড়ে পাহাড়ের দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে চাইলেন, কিন্তু আবহাওয়ার কোনো উন্নতি হলো না। তখন শিশুর লোকেরা উঁচু পাহাড়ের চূড়োয় গেফান দেবতার মন্দিরে পুজো দিল। ছাগ বলি দিয়ে, তার উষ্ণ হৃৎপিণ্ড উৎসর্গ করল লাহুল দেবতার উদ্দেশে।

এত করেও কিন্তু শিশুর অবস্থা দিনে দিনে খারাপ হতে থাকে। তখন গোন্ধলার গুরকে ডাকা হলো। তার মুখ দিয়েই দেবতা জানাতেন তাঁর নির্দেশ। এই গুরের ওপরেই দেবতার ভর হতো।

মন্দিরে গিয়ে গুরের মাধ্যমে দেবতাকে প্রশ্ন করল গ্রামবাসীরা,

'হে পাহাড়ের দেবতা, তুমি আমাদের কেন এত কষ্ট দিচ্ছ? আমরা কি অপরাধ করেছি?'

দেবতা উত্তর দিলেন, 'তোমরা খুব অহঙ্কারী হয়ে উঠেছ। তোমাদের মধ্যে সেই আন্তরিক আতিথেয়তা আর নেই যা প্রতিটি মানুষের ধর্ম। শিলা শিখরের স্পিতি দেবতা কিউলিং তোমাদের উপর খুব রেগে গেছেন। কারণ তাঁর মন্দিরের পুরোহিতকে তোমরা কোনো আদরযত্ন তো করোইনি, বরং কটু কথা বলে বিদায় করেছ, যখন সে কারদাং গোম্ফায় যাবার পথে তোমাদের গ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। দেবতারা যতক্ষণ অসন্তুষ্ট থাকবেন ততক্ষণ তোমাদের ক্ষেতে ফসল ফলবে না, গাভী দুগ্ধবতী হবে না।'

এ কথা শুনে যেন ডিসেম্বরের তুষারঝড় বয়ে গেল পাহাড়ী মানুষদের শিরদাঁড়া বেয়ে। বৃদ্ধরা বলতে লাগল, 'আমরা খুব অপরাধ করেছি, সেজন্য অনুতপ্ত! এখন আমাদের বাঁচার পথ

বাৎলে দাও। যদি আর একটি ফসলের দানাও নষ্ট হয়, আমাদের বাচ্চারা শীতকালে না খেয়ে মারা যাবে।'

'কিন্তু কি করে তোমরা রুষ্ট দেবতাকে সন্তুষ্ট করবে? তোমরা কি ভেবেছ কিউলিং দেবতা তোমাদের ঐ ছোট্ট ছাগল বা আধপেটা ইয়াক বলিতে খুশি হবেন?'

'তা হলে কি হবে!' গ্রামবৃদ্ধরা সবাই একসঙ্গে আর্তনাদ করে ওঠে।

তখন দেবতা নির্দেশ দিলেন, 'ছাগল বা ইয়াক বলি দিলে হবে না। একমাত্র মানুষের রক্তই ক্ষুব্ধ দেবতার তৃষ্ণা মেটাতে পারবে।'

কি আর করবে অসহায় পাহাড়ী মানুষেরা? তারা চম্বা-লাহুলে লোক পাঠাল বলির মানুষ কিনে আনতে। কিন্তু কেউই রাজী হলো না তাদের জন্যে মানুষ বেচতে। ক্লান্ত, বিষণ্ণ, হতাশ মানুষগুলো অবশেষে সব আশা ত্যাগ করে চম্বা রাজার কাছে গিয়ে তাদের দুর্ভাগ্য ও সমস্যার কথা খুলে বলল। রাজা তাঁর মন্ত্রীকে ডেকে লাহুলের মানুষদের সাহায্য করতে বললেন। অনেক খুঁজে শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল লোরালাই নামে এক পিতৃমাতৃহীন মেয়েকে। এক পাটা সোনার বিনিময়ে চম্বার লোকেরা এই অনাথ মেয়েটাকেই সঁপে দিল তাদের হাতে। লোরালাই ভিতরের কথা কিছুই জানত না। সে বরং পেটভরে দুবেলা খেতে পাবার আশায় খুশি মনে শিশু গ্রামে চলল। লাহুলের লোকেদের মিষ্ট ব্যবহার তার খুব ভাল লাগল। সেও সেখানে গেলে পাবে ওদের মতো গরম কাপড়-চোপড়, পাথরের মালা ও নানারকম খাবার-দাবার—ছাতু, বার্লি-পিঠে থুকপা। এসব কথা ভেবে তার আনন্দ আর ধরছিল না।

গাঁয়ের মুখিয়া শেয়াং-এর বাড়িতে লোরালাইকে থাকতে দেওয়া হলো। তার সুন্দর নম্র ব্যবহারের জন্যে সবাই তাকে ভালোবেসে ফেলল। শেয়াং তাকে দেখত নিজের মেয়ের মতোই। বেশ আনন্দেই কাটতে লাগল লোরালাইয়ের দিনগুলো। এদিকে বলির দিন ক্রমশ এগিয়ে আসছে।

একদিন শিশু গ্রামের বাচ্চাদের সঙ্গে যখন লোরালাই খেলছিল, তখন একটি ছেলে বলল, 'লোরালাই মনের সুখে আজ যত পারিস খেয়ে নে। তোকে তো কালই দেবতা কিউলিংয়ের মন্দিরে বলি দেওয়া হবে।'

'না, না, আমি না! এ হতেই পারে না!' লোরালাই চীৎকার করে বলে ওঠে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই-ই। গতকাল রাতে আমি বাবাকে বলতে শুনেছি মুখিয়ার কাছে। কিউলিং দেবতাকে খুশি করার জন্য তোকে বলি দিতেই হবে। তাই তো তোকে আদরযত্ন করে নিয়ে এসেছে চম্বা থেকে।'

লোরালাই ঝোড়ো বাতাসের মতো উড়ে গিয়ে শেয়াংকে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, কাল তোমরা আমাকে দেবতার সামনে বলি দেবে?'

শেয়াং-এর গাল বেয়ে জলের ধারা নামল। মুখে তাকে আর কোনো কথা বলতে হলো না। লোরালাই বুঝে গেল।

পরের দিন মহাসমারোহে বলির আয়োজন হলো। লাহুলস্পিতির লোকেদের প্রিয় পানীয় ছাং এলো ঘড়া ঘড়া। সবচেয়ে ভালো পোশাক পরে সবাই অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। তারপর একসময় পুরোহিত লোরালাইকে নিয়ে পূজা-অঙ্গনে এলো। লোরালাইয়ের মুখে ভয়ের চিহ্নও নেই। মরে যাবার আগে সে শুধু তার শেষ ইচ্ছা জানাল, পবিত্র চন্দ্রানদীতে একবার ডুব দিতে চায়। লোরালাইয়ের এই শেষ ইচ্ছায় পুরোহিত বাধা দিল না।

চন্দ্রানদীর একটু উপরে একখানি পাথরে এসে বসল লোরালাই। চোখ বন্ধ করে সে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে লাগল, 'হে মা মহাদেবী হিড়িম্বা, তুমিই একমাত্র ভরসা কুলু আর চম্বার মানুষদের। তোমার করুণা না পেলে আমি মারা যাব। মা, আমায় বাঁচাও, বাঁচাও।'

প্রার্থনা শেষে পাহাড়ের উপর থেকে নেমে চন্দ্রানদীর দিকে যখন লোরালাই যাচ্ছিল, কোত্থেকে মেটে রঙের একটা গরু এসে হাজির। লোরালাই গরুর লেজ ধরে চন্দ্রানদীর দিকে নামতে লাগল। বরফঠাণ্ডা চন্দ্রানদীর জলে তীব্র স্রোত। সেখানে পা দিলে আর বাঁচার উপায় নেই। কিন্তু গরুটি নদীর পাড়ে যাওয়া মাত্র সেই মৃত্যুশীতল স্রোত হয়ে গেল শান্ত এক হ্রদের মতো। গরুটি অবলীলায় সেটি পার হয়ে গেল পেছনে তার লেজ ধরে ঝুলে থাকা লোরালাইকে নিয়ে। আর তখনই পাহাড়ের উপরের পাইনের বন থেকে নেমে এলো সবুজ পরীর দল। তারা লোরালাইয়ের হাত ধরে উড়ে গেল দূর পাহাড়ের সীমানা ছাড়িয়ে।

এবার শিশুর লোকেদের কি হবে? তাদের দুর্ভাগ্যের শেষ তো হয়নি। অগত্যা তারা গেফান দেবতার কাছে গিয়ে হত্যা দিয়ে পড়ে রইল। যতক্ষণ পর্যন্ত না দেবতার দয়া হয় তারা মন্দির ছেড়ে যাবে না। অবশেষে দেবতার দয়া হলো। তাঁরই তো দায়িত্ব এইসব লোকের শুভাশুভ দেখবার। লাহুলের গেফান দেবতা স্পিতির কিউলিং দেবতার সঙ্গে কথা বলে একটা রফা করলেন। সেই রফা মতো শিশুর লোকেরা স্পিতিতে কিউলিং দেবতার মন্দিরে একুশটি ভেড়া, এগারটি ছাগল এবং একটি ইয়াক বলি দিল। দেবতা এবার সন্তুষ্ট হয়ে তাদের ক্ষমা করলেন। আবার শিশু গ্রামের উপত্যকা ভরে উঠল সবুজ শস্য ও ফল ফুলে।

মহাদেবী হিড়িম্বা কিন্তু চম্বার রাজা আর মন্ত্রীকে কোনোদিন ক্ষমা করেননি অসহায় অনাথা লোরালাইকে নিষ্ঠুরভাবে লাহুলের লোকেদের কাছে বিক্রি করে দেবার জন্যে। একদিন রাজা দরবারে বসে বিচার করছিলেন, সহসা তাঁর উপর অভিশাপ নেমে এসেছিল। আচমকা বজ্রপাতে তিনি অন্ধ হয়ে গেলেন। আর তাঁর মন্ত্রী যখন একদিন বনের ধারে বেড়াচ্ছিলেন, মেটে রঙের একটা বিরাট ভালুক এসে তাঁকে মুখে করে তুলে নিয়ে গেল ঘন জঙ্গলের মধ্যে। কোনোদিন তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

প্রশ্ন ঃ

১। দাঁড়িপাল্লা হাতে চোখ বাঁধা নারীমূর্তি কিসের প্রতীক—শান্তি, ন্যায় না ঐক্যের ?

২। ক্রোমিয়াম, ক্রিপ্টন আর ম্যাগনেসিয়ামের মধ্যে ধাতু নয় কোনটি ?

৩। কুকুর, হাতি, এমু আর আরশোলার মধ্যে অমেরুদণ্ডী প্রাণী কে ?

৪। মাংসাশী নয় কে—লিংকস, নেকড়ে, লামা না শীল ?

৫। কোটোপ্যাক্সি পাহাড় কোথায়—ইতালি, ইকোয়েডর না কানাডা ?

৬। রেনেসাঁস শুরু হয় ফ্রান্স, ইংলন্ড না ইতালিতে ?

৭। শরীরে কিসের অভাবে ডি-হাইড্রেশন হয়—লবণ, জল না ভিটামিন ?

৮। কার প্রাসাদকে বলা হয় অলকাপুরী—কুবের, ইন্দ্র না বিষ্ণু ?

৯। বাবর রাণা সঙ্গকে কোন যুদ্ধে পরাজিত করেন—হলদিঘাট, খানুয়া না চৌসা ?

১০। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের মধ্যে কার শাঁখের নাম ছিল অনন্তবিজয় ?

১১। মকবুল ফিদা হুসেন একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক, সঙ্গীতশিল্পী, চিত্রশিল্পী না সমাজসেবী ?

১৩। সরকারীভাবে 'হেলেনিক রিপাবলিক' কোন দেশটিকে বলা হয় ইতালি না গ্রীসকে ?

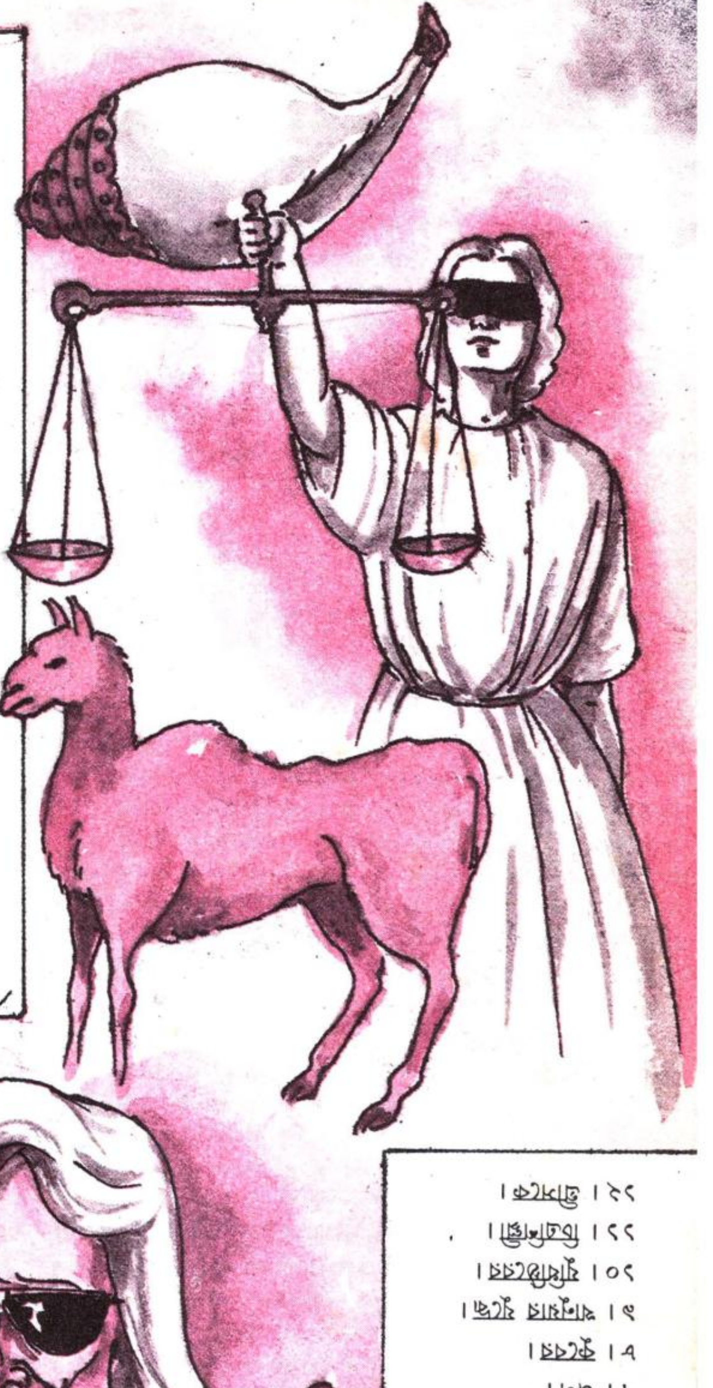

ছবিঃ রাহুল মজুমদার

উত্তর ঃ

১। ন্যায়।
২। ক্রিপ্টন।
৩। আরশোলা।
৪। লামা।
৫। ইকোয়েডর-এ।
৬। ইতালিতে।
৭। জল।
৮। কুবের।
৯। খানুয়ার যুদ্ধে।
১০। যুধিষ্ঠিরের।
১১। চিত্রশিল্পী।
১২। গ্রীসকে।

বিলির বুট

(৬৬)

প্রাক্তন খেলোয়াড় ডেড সট কিনের এক জোড়া ছেঁড়া বুট খুঁজে পেয়েছিলো বিলি। বুটটা পরে খেললেই বিলির খেলা একদম ডেড সটের মতো হয়ে যায়। বড়দিনের দিন সিনিয়ারদের সঙ্গে খেলতে নেমে বিলি একদম খেলতে পারলো না। মন খারাপ করে বাড়ি ফিরে দেখলো তার কাকা-কাকিমা এসেছেন। ফুটবল খেলা একদম পছন্দ করেন না ওঁরা। বড়দিনের ছুটির সময়টা ওঁদের কাছে রাখার জন্যে বিলিকে নিয়ে চললেন ওঁরা। তার মানে বিলির দু হপ্তা ফুটবল খেলা বন্ধ।...

মন্দ নয়। চলবে। এইভাবেই বলটা মাথা দিয়ে নামিয়ে এনে গোলরক্ষককে হার মানাতে হয়।
বঅপপ!
ছেলেটা খেলতে পারে।
জাপপ!
আসছে সোমবার আমাদের একটা ম্যাচ আছে। তুমি খেলবে আমাদের সঙ্গে। ওয়েভিল রোডের শেষ প্রান্তে খেলা হবে।
ওটা আমাদের লীগের খেলা। জিততে পারলে আমরা টপে চলে যাবো।
আমাদের একজন কম পড়ছে।
কিন্তু আমার... আমার সঙ্গে যে বুট-টুট নেই!
ঠিক আছে, তোমার জন্যে বুটের ব্যবস্থা আমরা করবো...
তুমি যদি এমনি জুতো পরেও খেলো কিছু এসে যায় না। ওয়েভিল রেঞ্জার্স অতি সাধারণ দল।
হাঃ হাঃ
আমি ভালো খেলতে না পারলে কিন্তু দোষ দিতে পারবে না।
বিলি-ই-ই-! ওখানে কি করছো? ঐ গুণ্ডাগুলোর সঙ্গে মিশবে না। এক্ষুণি চলে এসো!
এরা মোটেই গুণ্ডা নয়!
বাদ দাও তো! তোমার কাকিমা সকলকেই গুণ্ডা ভাবেন। ও নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না।
আমি তোমায় ঐ রাস্তার ছেলেগুলোর সঙ্গে কিছুতেই খেলতে দেবো না। তোমার কাকাও তা পছন্দ করবেন না...
ওরা মোটেই ভালো ছেলে নয়! তা ছাড়া এ পাড়ায় আমাদের সকলে মেনে চলে। তুমি ওদের সঙ্গে মিশবে না। যাও, এখন শুতে যাও!
বিলি তার ঘরে গিয়ে স্যুটকেস থেকে জামাপ্যান্ট বের করছিলো
এ কী! এটা তো আমি ওখানে রাখিনি...
বুঝতে পেরেছি! এ ঠাম্মার কাজ। তোমায় লাখো লাখো সেলাম ঠাম্মা। এইরকম ঠাম্মা কার হয়! এক ফাঁকে স্যুটকেসে বুটটা ভরে দিয়েছে।
ঠাম্মা ডেড সটের জীবনীটাও সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলেন
ডেড সট এক সময় রাস্তায় ছেলেদের সঙ্গে খবরের কাগজ গোল করে পাকিয়ে বল বানিয়ে ফুটবল খেলতেন...
ডেড সট একবার লন্ডনের ওয়েভিল রোডের শেষ প্রান্তে জল জমা একটা জায়গায় রাস্তার ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলেছিলেন...
ওয়েভিল রোড! আশ্চর্য! ঐখানেই তো সোমবারে আমায় খেলতে বলছে। তার মানে ডেড সটের জীবনে যা যা ঘটেছে আমার জীবনেও তাই ঘটবে!!
কি হবে এবার? কাকিমা কি বিলিকে সোমবারে খেলতে দেবেন?

ভবতোষকুমার ঘোষ স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কৃত গল্প

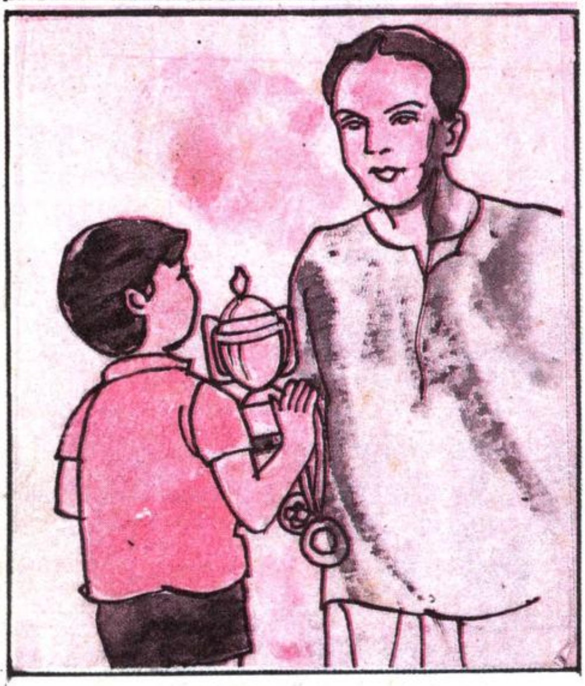

পয়সা খোঁজা দৌড়

মামোন দেবনাথ

তখন সবে প্রথম শ্রেণীতে পড়ি। স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়ায় এক অভিনব প্রতিযোগিতা ছিল পয়সা খোঁজা দৌড়। মাঠের মাঝখানে ধুলোবালির মধ্যে পয়সা লুকিয়ে রাখা হবে। পঁচিশ মিটার দৌড়ে এসে পয়সা নিয়ে আবার পঁচিশ মিটার দৌড়ে যেতে হবে। আমি ভাল দৌড়তে পারতাম। আর ঐ পয়সা খোঁজার আনন্দে নাম দিয়ে দিলাম ঐ প্রতিযোগিতায়। তবে কীভাবে পয়সা খুঁজতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না।

ক্রীড়ার দিন এই বিশেষ প্রতিযোগিতার জন্য সকলেই বেশ উত্তেজনায় টান টান হয়েছিল। যেখান থেকে দৌড় শুরু হবে সেখানে গিয়ে দেখলাম প্রথম শ্রেণী থেকে শুধু আমিই একমাত্র প্রতিযোগী। বাকিরা হয় তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে নয়তো চতুর্থ শ্রেণীতে। অত বড় বড় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পেরে উঠব কিনা সে বিষয়ে একটু ভয় ছিল। যাই হোক বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়তে লাগলাম। নির্দিষ্ট জায়গায় এসে পয়সা খুঁজছি। এপাশ, ওপাশ খুঁজে প্রায় চার/পাঁচ মিনিট পর তিনটে দশ পয়সা পেলাম। ততক্ষণে তিনজন প্রতিযোগী এগিয়ে গেছে। আমি হতাশ হয়ে পড়লেও পয়সা তিনটে পেয়ে মনে মনে ভাবলাম, পুরস্কার না পেলেও পয়সাগুলো তো পাব। হঠাৎ কে যেন বলে উঠল,জোরে দৌড়োও। আমি খুব জোরে ছুটে শেষ প্রান্তে চলে এলাম। একজন দিদিমণি আমার হাতের পয়সা দেখে আমাকে নিয়ে গেলেন একজন মাস্টারমশায়ের কাছে। বললেন, এই ঠিক এনেছে। ক্রীড়াশিক্ষক মহাশয় আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন। একজন দিদিমণি আমার নাম ক্লাশ সব লিখে নিলেন একটা খাতায়। সবার শেষে এসে এত বাহবা পেলাম কি করে সেটা কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না।

খেলা শেষ হলো বিকেল চারটের সময়। আমি কোনো কিছুতে প্রথম তিনজনের মধ্যে আসতে পারিনি। তাই মনটা খুব খারাপ ছিল। পুরস্কার বিতরণ শুরু হয়ে গেছে। হঠাৎ আমার নাম শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। পয়সা খোঁজার দৌড়ে পুরস্কার নিতেই আমাকে ডাকা হচ্ছে। এগিয়ে গেলাম মঞ্চের দিকে। প্রধান শিক্ষক মহাশয় আমার হাতে তিনটে পুরস্কার তুলে দিলেন। প্রতিটার গায়ে লেখা 'পয়সা খোঁজা দৌড়'। লক্ষ্য করলাম প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় তিনটে পুরস্কারই আমি একা পেয়েছি। তখন ব্যাপারটা বুঝলাম। যারা আগে গিয়েছিল তারা সবাই বাড়ি থেকে সিকি, আধুলি নিয়ে এসেছিল। কিন্তু প্রতিযোগিতায় দশ পয়সা ছাড়া আর কোনো পয়সাই রাখা ছিল না। তাই ওরা সব বাতিল হয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, শাস্তিও দেওয়া হয়েছিল প্রত্যেককে। আর আমি অসৎ উপায় অবলম্বন করিনি বলে সবার শেষে পৌঁছেও তিনটে পুরস্কার একাই পেয়েছিলাম।

পুরস্কার নিয়ে বাড়ি এলাম। বাবার কাছে পুরো ব্যাপারটা বলতে বাবা বললেন, সত্যের জয় হবেই। তুমি সৎ পথে গেছ। তাই পুরস্কার পেয়েছ। এরপর কত বছর কেটে গেছে। সেদিনের কথাটা আমি আজও ভুলিনি।

ভবতোষকুমার ঘোষ স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কৃত গল্প

জলটোপ

তুষার মিঞা

চোর, তুই চোর! মাসীমার দোষারোপ শুনে আমি কাঁদলাম। ভীষণ কাঁদলাম। আমি যদি মাসীমার নিজের ছেলে হতাম, তবে কি তিনি এমনি করে 'চোর' বলতে পারতেন?

মাসীমার নাকের সোনার জলটোপটা হারিয়ে গেছে। তখন থেকেই খুঁজছেন মাসীমা আর আমাকে গালাগাল দিচ্ছেন। কারণ আমি এ বাড়ির কাজের ছেলে। হা-ভাতে ঘরের ছেলে বলেই তো এই নাবালক বয়সেই পরের বাড়িতে কাজ করে খেতে হয়। আমি চুরি না করলে করল কে?

আমারই বয়সী সুচি। ভাল নাম সুচেতা। কেমন নীল রঙের ইউনিফর্ম পরে প্রজাপতির মতো বাতাসে ভাসতে ভাসতে স্কুলে যায়। আমি তাকিয়ে দেখি। আমার কিন্তু একটুও হিংসে হয় না। সুচি যে আমার বোন। হোক না পাতানো। তবু তো কোনো সময় মনে হয় না 'দিদিভাই' আমার বোন নয়।

এ সময় যদি দিদিভাই থাকতো তাহলে আমাকে এমন করে বকাঝকা খেতে হতো না। আজ সকালেই দিদিভাই মৌরী গেছে পিসীর বাড়ি। ওদের বাড়ির গাড়িতে তুলে দিয়ে ফিরে আসতেই এই বিপত্তি। মাসীমা তাঁর জলটোপ খুঁজছেন, পাচ্ছেন না।

হায় রে সোনার জলটোপ! কোথায় গেলে তুমি? ছিলে তো বাথরুমের তাকের উপরে। মাসীমা রেখেছিলেন সকালবেলায়। তারপর দিদিভাইকে পিসীর বাড়ি রওনা করার ব্যস্ততায় ভুলে গেছিলেন। এখন দেখছেন সেখানে তুমি নেই। তাহলে কোথায় আছো তুমি?

এ বাড়িতে আমি ছাড়াও কাজের লোক আছে মিশিরজী। তা সে বেচারা তো সারাদিন রান্নাঘরে থাকে। কাজের শেষে তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ে। তার তো কোনো মতেই উপরে আসার কথা নয়। তবু আমি তার কাছে গেলাম।

মিশিরজী, আপনি কি ওপরে গেছিলেন?

খুন্তি নাড়া থামিয়ে মিশিরজী বললেন, নেহী তো বাবুয়া! কিঁউ, কেয়া হুয়া?

সব বললাম। মিশিরজী বললেন, ভগওয়ানকো নাম লে, সব ঠিক হো যায়েগা।

বাইরে গাড়ির শব্দ। দিদিভাইদের পৌঁছে দিয়ে আবদুল চাচা ফিরে এল। আবদুল চাচা এ বাড়ির আরো একজন কর্মচারী। সেও ওপরে ওঠে না। সারা দিন-মান তার গাড়ি নিয়ে কাজ। অবসরে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। আমার অশ্রুভরা চোখ দেখে আবদুল চাচা বলল, রোতা কিঁউ বেটা? বললাম, মাসীমার জলটোপ হারিয়ে গেছে। উনি আমাকেই চোর ভাবছেন। শুনে আবদুল চাচা মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, ঘাবড়াও মৎ, মেহেরবান আল্লাহ হ্যায় না, সব ঠিক হো যায়েগা।

একটু পরেই এলেন অ্যান্টনী-ফাদার। ইনি নাকি বাচ্চাদের একটা মিশনারী স্কুল করেছেন। এখনও সেটা সরকারি অনুমোদন পায়নি। দিদিভাইকে ইংরেজী পড়াতে আসেন অ্যান্টনী-সাহেব। আজ দিদিভাই হঠাৎ পিসীর বাড়ি চলে গেছে শুনে তিনি চলে

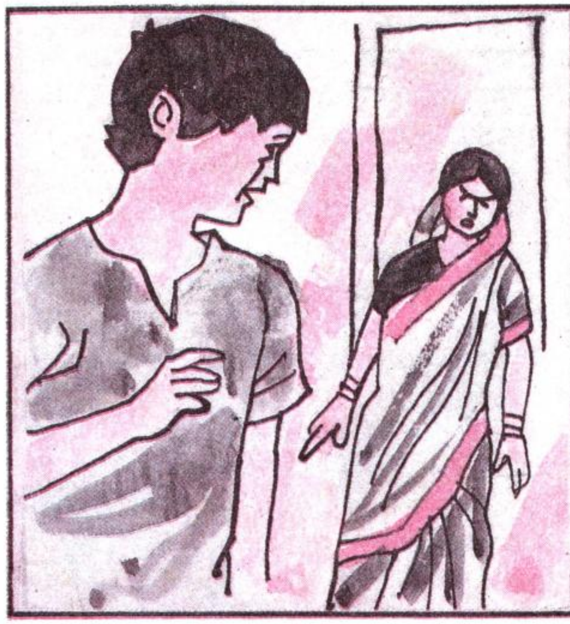

যাচ্ছিলেন। আমার সঙ্গে বাগানে দেখা। বললেন, এনি প্রবলেম? কাঁদতে কাঁদতে তাঁকেও সব বললাম। শুনে বুকে ক্রশ আঁকলেন ফাদার। বললেন, মে গড সেভ ইউ মাই চাইল্ড!

জলটোপ। হায় সোনার জলটোপ! তোমার জন্যে এ বাড়ি ছেড়ে আমি চলে যাব। তোমার জন্যেই আমি চোর হয়ে গেছি। তাই এ বাড়িতে আর আমার ঠাঁই নেই। ফিরে যাব আমাদের সেই ছোট্ট গ্রামে। সেখানে আমার বাবা থেকেও নেই। মা তো কবেই হারিয়ে গেছে অজানায়। আছে সৎমা। বড় বদমেজাজী। তার লাথি-ঝাঁটা খাব। হয়তো কারো বাড়িতে রাখাল খাটব। নয়তো ঝুড়ি নিয়ে গোবর কুড়োব। খেটেই তো খেতে হবে আমাদের।

দিদিভাই নেই তাই এখনও রওনা হইনি। দিদিভাই ফিরবে সেই বিকেলে। মেসোমশাই এক্ষুণি গাড়ি নিয়ে তাঁর অফিস রওনা হলেন। ফেরার পথে দিদিভাইকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন। আমি তখন বিদায় নেব। রাতের ট্রেন ধরে ফিরে যাব নিজের গ্রামে।

দিদিভাই, আমার দিদিভাই! তোমার ফেরার অপেক্ষায় আমি বসে আছি। এ বাড়ির সবাই আমাকে কাজের ছেলে ভাবলেও তুমি তা ভাবনি, বোনটি আমার। তাই যাবার সময় তোমাকে একটি বার দেখে যেতে বড় ইচ্ছে হয়। তোমাকে আর দেখতে পাব না ভাবলেও বুকের ভেতর দম বন্ধ হয়ে আসে, চোখে জমা হয় জলটোপ।

দিদিভাই, তুমি না বল, ধর্মমেব জয়তে। ধর্মপথে চললে, জয় হবেই। দিদিভাই, আমার চোখে তোমার সেই ধর্ম মিছে

কথা না বলা, চুরি না করা, হিংসা না করা। ওগুলো সবই অধর্ম। তবু দেখ, কেমন চোর অপবাদ নিয়ে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। তাই তো আমি মিশিরজীর 'ভগওয়ান', আবদুল চাচার 'আল্লাহ' আর ফাদার অ্যান্টনীর 'গড'কে ডাকছি। চলে আমি যাব। কিন্তু যাবার আগে আমি যেন প্রমাণ করতে পারি আমি চোর নই। সেই আমার জয়।

শেষ বিকেলে বাড়ি ফিরল দিদিভাই। মাসীর সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বললেন, জানো তোমার আদরের ভাই আজ কি কাণ্ড করেছে?

দিদিভাইয়ের মুখে সব সময় ফুলের পাপড়ি ঝরা হাসি। বলল, কেন, কি করেছে?

আমার জলটোপ চুরি করেছে।

তোমার জলটোপ! দিদিভাইয়ের মুখের পাপড়ি ঝরা হাসি বন্ধ হলো। এক পলক দেখে নিল আমার অপরাধী মুখ। বলল, সেটা কি বাথরুমে ছিল?

হ্যাঁ।

ওটা তো আমিই তোমার একটা খালি পাউডার-কেসে তুলে রেখেছি।

অ্যাঁ! মাসীমার বিস্ময়। আর আমি তখন থেকে খুঁজে খুঁজে সারা।

শুধু খুঁজেছো? চোর-ছ্যাঁচোড়-জোচ্চোর বলে ওকে গালাগাল দাওনি!

মাসীমা নির্বাক।

মা, মামণি আমার, তুমি মানুষকে বিশ্বাস করতে শিখলে না কেন! বলে দিদিভাই মাসীমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

বুক ভরে আমি মুক্তির শ্বাস নিলাম। কে বলে সত্যের জয় হয় না!

ছবি : সুফি

এঁদের লেখাও ভালোঃ

সন্দীপ সান্যাল, আসানসোল॥ জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা ৬০॥ তিমিরবরণ চঁদ, গুসকরা, বর্ধমান॥ স্বরূপ দাস, মেমারী, বর্ধমান॥ সন্দীপ্ত মজুমদার, চণ্ডীতলা, সোদপুর॥ বিশ্বনাথ মিত্র, চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান॥ শান্তনু বিশ্বাস, খড়দহ, উঃ ২৪ পরগনা॥ সোমা মৌলিক, আসানসোল॥

ঘোষণা

আদি ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়ের মালিক সঞ্জয় সাহা তাঁর প্রয়াত পিতামহ নিতাইলাল সাহার স্মরণে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। তাঁর প্রস্তাব মতো আমরা শুকতারার পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে মৌলিক লেখা চাইছি।

বিষয়বস্তু

পুজো আসছে

৺নিতাইলাল সাহা

মৃত্যুঃ ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮

লেখা পাঠাবার শেষ দিন ৩০ কার্তিক। পুরস্কৃত লেখা দুটি শুকতারার মাঘ সংখ্যায় ছাপা হবে।

প্রথম পুরস্কার—১০০ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার—৫০ টাকা

সৌজন্যেঃ আদি ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়

(শীততাপ নিয়ন্ত্রিত) গড়িয়াহাট জংশন

১৬১ এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ

কলকাতা-৭০০০১৯

নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু থেকে প্লেনে লুকলা। সেখান থেকে তিন দিন পায়ে হেঁটে ১৯৮৮ সালের মে মাসে ফাকডিং-নামচেবাজার হয়ে পৌঁছেছিলাম থিয়াংবোচিতে। আর বিখ্যাত থিয়াংবোচি মঠের ঠিক পাশের গুম্ফা লজে দেখেছিলাম ছেলেটিকে।

রং-চটা জিনসের ওপর টুকটুকে লাল সোয়েটার পরা অনর্গল

শেরপা কিশোর কামিতুন্দ্রা

শেরপা কিশোরের স্বপ্ন

// অরিন্দম দেবনাথ

পূবে সাগরমাতা (এভারেস্ট), লোত্সে, নুত্সে ও আমাদাবলাম, দক্ষিণে থামসারকু ও কাংতিগা, উত্তরে লবুচে ও পশ্চিমে গুম্বিলা। এইসব আকাশছোঁয়া বিখ্যাত শৃঙ্গগুলির মাঝে, দুধকোশী ও ইমজাখোলা নদী বেষ্টিত হয়ে শুয়ে আছে থিয়াংবোচির শান্ত স্নিগ্ধ উপত্যকা। সেখানকার আকাশ বাতাস ভরিয়ে রাখে থিয়াংবোচির বৌদ্ধমঠ থেকে ভেসে আসা সুগম্ভীর বাদ্য ও মন্ত্রোচ্চারণের ধ্বনি। গৌতম বুদ্ধের অমৃতবাণী উপত্যকার ওপর বর্ষিত হয় তাঁর আশীর্বাদের মতো। কী পবিত্র ও ভাবগম্ভীর এর পরিবেশ।

নেপালের খুম্বু হিমালয়ে থিয়াংবোচি মনেস্ট্রি তিব্বতী ও নেপালিদের কাছে অতি পুণ্যতীর্থ। ১৯২০ সালে ১২৭০০ ফুট উঁচু থিয়াংবোচি উপত্যকায় লামা চাতাং চোতরার তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠে থিয়াংবোচি মঠ তথা বৌদ্ধধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রটি। এই মঠ তৈরির কাজ খুব একটা সহজ ছিল না। কেননা স্থানটি ছিল ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও জনমানবহীন। এ ছাড়া বছরের প্রায় আটমাসই থাকত তুষারে আচ্ছাদিত। যখন তুষার গলত, তখন স্থানীয় কারিগরেরা বনজঙ্গল কেটে, কাঠ দিয়ে মঠ তৈরির কাজ করত। দীর্ঘ চার বছর লেগেছিল এই মঠ সম্পূর্ণ করতে।

১৯৩৩ সালে মঠটি এক ভূমিকম্পে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। ১৯৩৬ সালে আবার নতুন করে মঠটিকে গড়ে তোলা হয়। এবারে স্থানীয় কারিগরদের সাহায্য করেছিল তিব্বতের রাজধানী লাসার বাসিন্দা এক দক্ষ ও কুশলী সূত্রধর।

ইংরেজীতে কথা বলতে থাকা ঝকঝকে চেহারার কিশোরটির পিঠে মালবাহকের ঝুড়িটা আমাকে চমকে দিয়েছিল। পিঠের ঝুড়িটা বাদ দিলে বছর পনেরো বয়সের ছেলেটিকে দেখে নিঃসন্দেহে মনে হবে ইংরেজী মাধ্যম স্কুলে পড়া একটি স্মার্ট নেপালী কিশোর।

ওর সুঠাম-সুন্দর চেহারা, চপলতা ও সহজ-সরল কথাবার্তার টানেই চিনেছিলাম কামিতুন্দ্রা শেরপা নামের কিশোরটিকে। শুনেছিলাম তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথা। জেনেছিলাম ভবিষ্যতের কি লক্ষ্য সামনে রেখে সে বড় হচ্ছে।

আমি যখন থিয়াংবোচিতে, তখন নেপাল-চীন-জাপান আয়োজিত 'ত্রি-দেশীয় এভারেস্ট অভিযান ১৯৮৮' সমাপ্তির পথে। এভারেস্টে ওঠার মতো একটি বিরাট মাপের অভিযানে অনেক মালপত্র লাগে। সেসব বেস ক্যাম্প থেকে ফেরত আনার জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুরসংখ্যক মালবাহকের। দলে দলে মালবাহকেরা তাই চলেছিল বেস ক্যাম্পে। কামিতুন্দ্রাও চলেছিল তার দিদির সঙ্গে সমাপ্ত অভিযানের মাল বয়ে আনার কাজে যোগ দিতে।

কামিতুন্দ্রার বাবা সোনাম তাংবা শেরপা শুরু থেকেই এই ত্রি-দেশীয় এভারেস্ট অভিযানের সঙ্গে রয়েছেন। অভিযাত্রী দলে

শেরপা বাজার। ছবিঃ অভিমন্যু সেনগুপ্ত।

তিনি ছিলেন একজন হাই অল্টিটিউড পোর্টার হিসাবে। তাঁর কাজ ছিল উঁচু থেকে আরও উঁচুতে মালপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া। এ ধরনের কাজ শেরপা সমাজে অতি আদৃত। যেখানে উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে, সেখানে বরফের নদী, বরফখাদ আর খাড়া বরফের পাঁচিল অতিক্রম করে ভারী ভারী সরঞ্জাম হাজার হাজার ফুট ওপরের শিবিরে পৌঁছে দেওয়া সাধারণ মালবাহকের পক্ষে সম্ভব নয়। এ ছাড়া আছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, তুষারপাত ও তুষারঝড়ের মতো প্রতিবন্ধকতা। বিপদ সেখানে সবসময় ওৎ পেতে আছে। এ কাজের জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, কষ্টসহিষ্ণুতা, অনমনীয় মনোবল ও অবশ্যই পর্বতারোহণের প্রতি আকর্ষণ।

সোনাম তাংবা শেরপা বহু এভারেস্ট অভিযানে সঙ্গী হয়েছিলেন। সেসব অভিযান কখনও বা সফল হয়েছে, কখনও ব্যর্থ। ১৯৮৪ সালে 'ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশন' আয়োজিত এভারেস্ট অভিযানে বাচেন্দ্রীপালের সঙ্গে এভারেস্টের প্রায় মাথায় চড়েছিলেন সোনাম।

কামিতুন্দ্রাদের বাড়ি নেপালের খুম্বু জেলার ৯০০০ ফুট উঁচু লুকলা উপত্যকার ঘাঠ গ্রামে। চারদিকে তার সুউচ্চ বরফের শৃঙ্গ। বছরের মধ্যে ছ-মাস অঞ্চলটি বরফাচ্ছাদিত থাকে। বরফ গলে গেলে রঙবেরঙের ফুল ও গুল্মে উপত্যকা সেজে ওঠে। পাইন, ফার, ওক আর বার্চ গাছের পাতায় পড়ে ঘন সবুজের উজ্জ্বল প্রলেপ। শোনা যায় পাখির কলতান। ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায় বাহারি প্রজাপতি। বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পর্যটকদের আনাগোনা শুরু হয়ে যায় তাদের গ্রামের পথ ধরে। শস্যক্ষেত্রগুলো ভরে ওঠে ধান, গম ও আলুগাছের সবুজ কচি পাতায়।

কামিতুন্দ্রা মহেন্দ্রজ্যোতি লোয়ার সেকেন্ডারি স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। বাড়ি থেকে স্কুলে যেতে তাকে প্রায় এক ঘণ্টা হাঁটতে হয়। তাদের স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ১০০।

কামিতুন্দ্রাদের পড়ানো হয় অঙ্ক, ইংরাজী, নেপালী, সংস্কৃত, নীতিশাস্ত্র ও বিজ্ঞান। তবে তার সবচাইতে ভাল লাগে ইংরাজী পড়তে। এ অঞ্চলে অসংখ্য বিদেশী পর্যটকরা আসে মূলতঃ ট্রেকিং ও পর্বতাভিযান করতে। কামিতুন্দ্রা আমাকে বলে, অভিযাত্রী দলের মালবাহক বা মাউন্টেন গাইড হওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। ইংরাজী না জানলে ওদের সঙ্গে কথা বলব কি করে?

আমি জানতে চাই, স্কুলের সময়টা বাদ দিলে, বাকী সময় তোমার কি করে কাটে?

এ প্রশ্নের উত্তরে কামিতুন্দ্রা লাজুক হেসে যা বলল তা মোটামুটি এরকম—গরমকালে খুব সকালেই ঘুম থেকে ও উঠে পড়ে। তারপর হাতমুখ ধুয়ে করে বুদ্ধের উপাসনা। উপাসনা সাঙ্গ হলে কিছুক্ষণ পড়াশুনা। তারপর খেয়েদেয়ে বইপত্র বগলে নিয়ে গ্রামের আরও কয়েকজনের সঙ্গে স্কুলে যায়। স্কুলের পথটা তো ভীষণ লম্বা, তাই ফিরতে ফিরতে বিকেল গড়িয়ে যায়। স্কুল থেকে ফিরে কামিতুন্দ্রা বইপত্র রেখে লেগে পড়ে সংসারের কাজে মাকে সাহায্য করতে। জল আনা, কাঠ কাটা, ক্ষেতের কাজ এসবও ওকে করতে হয়। তারপর হাতমুখ ধুয়ে টিফিন খেয়ে পড়তে বসলেই কি করে যেন যত রাজ্যের ঘুম চোখে নেমে আসে।

শীতকালটা সবচাইতে কষ্টকর। এক বুক বরফ জমে যায় চারিদিকে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা শরীরের হাড়গুলোতে পর্যন্ত কাঁপুনি ধরায়। ডিসেম্বর, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী শীতকালের এই তিন মাস স্কুল ছুটি থাকে। তখন ঘরে বসে বসে পড়াশুনা ছাড়াও বন্ধুদের সঙ্গে বরফের মধ্যে লুটোপুটি করে খেলে সে। এ সময় খাবার জল সংগ্রহ করাটা বড়ই সমস্যা। কারণ পানীয় জলের ধারাগুলো জমে বরফ হয়ে যায়। তবে দিনের বেলা সূর্যের তাপে দু-একটা ঝরনা বেয়ে নেমে আসে তিরতিরে ধারায় বরফগলা জল। বহুদূর থেকে সে জল জ্যারিকেনে ভরে পিঠে চাপিয়ে নিয়ে আসতে হয়। খাবার বা জ্বালানি কাঠের ক্ষেত্রে এই অসুবিধাটা অবশ্য নেই। গরমকালেই সেগুলো সংগ্রহ করে ভাঁড়ারে ভরে রাখা হয়।

আমি জিজ্ঞেস করি, বড় হয়ে তুমি কি হতে চাও?

শুনে তার চোখেমুখে একটা খুশির ঝিলিক খেলে উঠল। খানিক স্বপ্নের ঘোরেই সে বলল, দূরের ওই বরফের চুড়োগুলো আমাকে ভীষণ টানে। বড় হয়ে বাবার মতন পোর্টার-কাম-মাউন্টেন গাইড হবো। আর ইচ্ছে আছে সাগরমাতার (এভারেস্ট) চুড়োয় ওঠার।

বহু যুগ আগে তিব্বত থেকে আসা এক উদ্বাস্তু উপজাতি নেপালের খুম্বু অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করে। তারা আজ সারা বিশ্বে 'শেরপা' নামে পরিচিত। সেই জাতিরই এক কিশোর, আধুনিক শহুরে সভ্যতা থেকে অনেক দূরে এক অজানা পাহাড়ী গ্রামে একটু একটু করে বড় হচ্ছে। সে তার কিংবদন্তী পূর্বসূরীদের দৃষ্টান্ত সামনে রেখে, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বা ব্যবসায়ী হবার চেষ্টা না করে মনে মনে বিখ্যাত পর্বতারোহী হবার ইচ্ছা পোষণ করবে, এ আর আশ্চর্য কি!

ছবিঃ ধ্রুব রায়

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও ১১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত

সবচেয়ে কম দামে সবচেয়ে ভালো পূজা সংখ্যা

ছোট বড় সবার প্রিয়

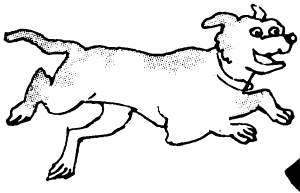

শারদীয়া

শুকতারা

১৪০০

গল্প, উপন্যাস, মজার মজার লেখা, ম্যাজিক, ট্রেকিং, খেলা, কমিকস আরো কতো কী!

ছটি সম্পূর্ণ উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবীর
সময়ই পাওয়া গেল না

চিত্তরঞ্জন মাইতির
মুম্বা

শিশিরকুমার মজুমদারের
চন্দ্রসরোবর প্রজেক্ট

পরেশ ভট্টাচার্যের
বনের হাতি বনে

অনিল ভৌমিকের
কাউন্ট রজারের গুপ্তধন

এবং

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পাতাল ঘরের রহস্য

খেলা নিয়ে লেখা
রাজু মুখার্জি, প্রসূন ব্যানার্জি ও দিব্যেন্দু বড়ুয়ার

বিশেষ আকর্ষণ

যাদুকর পি.সি. সরকারের (জুনিয়র)
কমিকসে ম্যাজিক

অভিনেতা রবি ঘোষের
পায়ে পড়ি বাঘ মামা

নারায়ণ দেবনাথের
হাঁদা-ভোঁদা, বাহাদুর বেড়াল ও বাঁটুল

রতন মুখোপাধ্যায়ের
মোল্লা নাসিরুদ্দীন
সুফির
কমিকস

গল্প, কবিতা, ছড়া ও ফিচারের ডালি সাজাচ্ছেন

লীলা মজুমদার, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মহাশ্বেতা দেবী, নলিনী দাশ, শৈলেন ঘোষ, কৃষ্ণ ধর, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অদ্রীশ বর্ধন, মঞ্জিল সেন, অজেয় রায়, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, ডাঃ বিশ্বনাথ রায়, অগ্নিমিত্র, মনোরঞ্জন ঘোষ, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, প্রণবেশ চক্রবর্তী, রবিদাস সাহারায়, ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তপনকুমার দাশ, আশিস সান্যাল, ডাঃ অমিয়কুমার হাটি, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, নটরাজন, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সংকর্ষণ রায়, সুকুমার ভট্টাচার্য, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, রমেন দাশ, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, মুস্তাফা নাশাদ, সমীর গোস্বামী, নারায়ণ সাহা, ধূর্জটি চন্দ, মানবেন্দ্র পাল, রূপক চট্টরাজ, সুখেন্দু ভট্টাচার্য, গৌরী দে এবং আরো অনেকে।

দাম: ৩৪ টাকা মাত্র

SK দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড; ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা—৭০০০০৯

Registration No. W. B./E. C.—60 August '93 "Suktara"

পেটের গোলমাল ?
অম্লরোগ ? ক্ষুধামান্দ্য ? কোষ্ঠকাঠিন্য ?

ডাঃ সরকার বলেন—

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষায় লিভার।

যদি লিভার ও স্টম্যাকের কাজ ভালো না হয় বা মানসিক অশান্তি জনিত ভালো ঘুম না হয়, তবেই পেটের গোলমাল হয়। সর্বাধিক রোগের কারণ এই পেটের গণ্ডগোল, তাই যদি সুস্বাস্থ্য চান — পেটের গোলমাল সারান, আর লিভারের সুরক্ষায় হন যত্নবান।

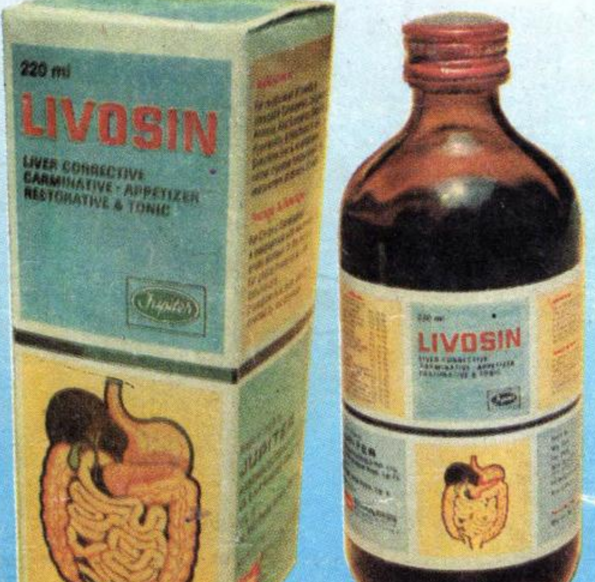

পেটের গোলমাল সারাতে ও লিভারের সুরক্ষায়

ডাঃ সরকারের এক ফলপ্রসু আবিষ্কার (মাইকেল মধুসূদন একাডেমী পুরস্কৃত)

লিভোসিন - আয়ুর্বেদিক লিভার টনিক।

ব্যবহার বিধি ঃ

দু-চা চামচ করে লিভোসিন এক গ্লাস অল্প গরম জল-সহ সকালে খালি পেটে ও রাতে শোয়ার আগে সেবন করুন, যতদিন না- বুক জ্বালা সারে, হজমশক্তি বাড়ে, অম্লরোগ, ক্ষুধামান্দ্য ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়, পেটের গোলমাল সারে আর সৌন্দর্য বাড়ে।

লিভোসিন

লিভার করেকটিভ, কারমিন্যাটিভ
অ্যাপিটাইজার, রেস্টোর‍্যাটিভ্-টনিক্।

অ্যালোপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক ওষুধ প্রস্তুতকারক ঃ
জুপিটার ফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রাঃ লিঃ
২৫, ইডেন হস্‌পিটাল রোড, কলিকাতা-৭৩
ফোন ঃ ২৬-০১৫৬/২৭-০২২৪/৭৭-৭০৭৫/৩৩-৭০২৬

Jupiter Emars Allen

আর্ণিকাপ্লাস-ট্রায়োফার নির্মাতাদের সহযোগী সংস্থা Jupiter এর আয়ুর্বেদিক গবেষণার একটি উপহার।

যাদের যত্নেই আপনার আরোগ্য ও আস্থা

সমস্ত অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়।

Allen's Ad. India